মাসিক

তর্জুমানুল হাদীস

কুরআন-সুন্নাহর শাশ্বত বিধান, জীবন-দর্শন ও কার্যক্রমের অকুণ্ঠ প্রচারক

৯ম বর্ষ
৬ষ্ঠ সংখ্যা
সেপ্টেম্বর-২০২৬

ঐতিহাসিক বুখারা নগরী, উজবেকিস্তান

সূচিপত্র

মাসিক
তর্জমানুল হাদীস

রেজি নং ডি.এ.১৪২

বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীসের গবেষণামূলক মুখপত্র

مجلة البحوث العلمية الناطقة بلسان جمعية أهل الحديث ببنغلاديش

مجلة ترجمان الحديث الشهرية

প্রতিষ্ঠাতা: আল্লামা মোহাম্মদ আব্দুল্লাহেল কাফী আল-কোরায়শী (রহ)

কুরআন-সুন্নাহর শাশ্বত বিধান, জীবন-দর্শন ও কার্যক্রমের অকুণ্ঠ প্রচারক

প্রতিষ্ঠাতা : আল্লামা মোহাম্মদ আব্দুল্লাহেল কাফী আল-কেরায়শী (রহিমাহুল্লাহ)

সম্পাদক মণ্ডলীর প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি : প্রফেসর ড. মুহাম্মদ আব্দুল বারী (রহিমাহুল্লাহ)

বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস কর্তৃক প্রকাশিত ও প্রচারিত সেপ্টেম্বর ২০২৬ মাসের সালাতের সময়সূচী (ঢাকার জন্য)

তারিখ	ফজর	যোহর	'আসর	মাগরিব	'ইশা
০১.০৯.২৬	০৪:২৪	১১:৫৯	০৩:২৯	০৬:৪১	০৮:০৪
০২.০৯.২৬	০৪:২৪	১১:৫৮	০৩:২৯	০৬:৪১	০৮:০৩
০৩.০৯.২৬	০৪:২৫	১১:৫৮	০৩:২৯	০৬:৪০	০৮:০২
০৪.০৯.২৬	০৪:২৫	১১:৫৮	০৩:৩০	০৬:৪০	০৮:০১
০৫.০৯.২৬	০৪:২৬	১১:৫৭	০৩:৩০	০৬:৩৯	০৮:০১
০৬.০৯.২৬	০৪:২৬	১১:৫৭	০৩:৩০	০৬:৩৮	০৮:০০
০৭.০৯.২৬	০৪:২৭	১১:৫৭	০৩:৩০	০৬:৩৮	০৭:৫৯
০৮.০৯.২৬	০৪:২৭	১১:৫৬	০৩:৩০	০৬:৩৭	০৭:৫৮
০৯.০৯.২৬	০৪:২৮	১১:৫৬	০৩:৩০	০৬:৩৬	০৭:৫৭
১০.০৯.২৬	০৪:২৮	১১:৫৬	০৩:৩০	০৬:৩৬	০৭:৫৬
১১.০৯.২৬	০৪:২৯	১১:৫৫	০৩:৩০	০৬:৩৫	০৭:৫৫
১২.০৯.২৬	০৪:২৯	১১:৫৫	০৩:৩০	০৬:৩৪	০৭:৫৪
১৩.০৯.২৬	০৪:২৯	১১:৫৫	০৩:৩০	০৬:৩৩	০৭:৫৩
১৪.০৯.২৬	০৪:৩০	১১:৫৪	০৩:৩০	০৬:৩৩	০৭:৫২
১৫.০৯.২৬	০৪:৩০	১১:৫৪	০৩:৩০	০৬:৩২	০৭:৫১
১৬.০৯.২৬	০৪:৩০	১১:৫৪	০৩:৩০	০৬:৩১	০৭:৫০
১৭.০৯.২৬	০৪:৩১	১১:৫৩	০৩:৩০	০৬:৩০	০৭:৪৯
১৮.০৯.২৬	০৪:৩১	১১:৫৩	০৩:২৯	০৬:২৯	০৭:৪৮
১৯.০৯.২৬	০৪:৩২	১১:৫২	০৩:২৯	০৬:২৮	০৭:৪৭
২০.০৯.২৬	০৪:৩২	১১:৫২	০৩:২৯	০৬:২৮	০৭:৪৬
২১.০৯.২৬	০৪:৩২	১১:৫২	০৩:২৯	০৬:২৭	০৭:৪৫
২২.০৯.২৬	০৪:৩৩	১১:৫১	০৩:২৯	০৬:২৬	০৭:৪৪
২৩.০৯.২৬	০৪:৩৩	১১:৫১	০৩:২৯	০৬:২৫	০৭:৪৩
২৪.০৯.২৬	০৪:৩৩	১১:৫১	০৩:২৮	০৬:২৪	০৭:৪২
২৫.০৯.২৬	০৪:৩৪	১১:৫০	০৩:২৮	০৬:২৩	০৭:৪১
২৬.০৯.২৬	০৪:৩৪	১১:৫০	০৩:২৮	০৬:২২	০৭:৪০
২৭.০৯.২৬	০৪:৩৫	১১:৫০	০৩:২৮	০৬:২১	০৭:৩৯
২৮.০৯.২৬	০৪:৩৫	১১:৪৯	০৩:২৮	০৬:২০	০৭:৩৮
২৯.০৯.২৬	০৪:৩৫	১১:৪৯	০৩:২৭	০৬:১৯	০৭:৩৭
৩০.০৯.২৬	০৪:৩৬	১১:৪৯	০৩:২৭	০৬:১৮	০৭:৩৬

ঢাকার সময়ের আগে	সময়	ঢাকার সময়ের পরে
নারায়নগঞ্জ, নরসিংদী, মুন্সীগঞ্জ, পিরোজপুর	১ মিনিট	গাজীপুর, খুলনা, গোপালগঞ্জ
চাঁদপুর, বরিশাল, বি.বাড়িয়া	২ মিনিট	ময়মনসিংহ, ফরিদপুর, মানিকগঞ্জ
সিলেট, হবিগঞ্জ	৩ মিনিট	টাংগাইল, সাতক্ষীরা
কুমিল্লা, মৌলভী বাজার	৪ মিনিট	যশোর, সিরাজগঞ্জ, রাজবাড়ী, শেরপুর, জামালপুর, ঝিনাইদহ
নোয়াখালী	৫ মিনিট	পাবনা, কুষ্টিয়া
ফেনী	৬ মিনিট	বগুড়া * ১০ মিনিট পরে : চাঁপাইনবাবগঞ্জ, সৈয়দপুর
	৭ মিনিট	গাইবান্ধা, নাটোর, মেহেরপুর, কুড়িগ্রাম
	৮ মিনিট	নওগাঁ, রাজশাহী * ১৩ মিনিট পরে : ঠাকুরগাঁও, পঞ্চগড়
চট্টগ্রাম	৯ মিনিট	জয়পুরহাট, রংপুর, লালমনিরহাট
কক্সবাজার	১১ মিনিট	দিনাজপুর, নীলফামারী

সূর্যাস্তের সময় অনুসারে ঢাকার সময়ের সাথে কিশোরগঞ্জ ও বাগেরহাট

সূচিপত্র

بسم الله الرحمن الرحيم

মাসিক

مجلة ترجمان الحديث الشهرية

তর্জুমানুল হাদীস

রেজি নং ডি.এ.১৪২

৩য় পর্ব

৯ম বর্ষ, ৬ষ্ঠ সংখ্যা

সেপ্টেম্বর ২০২৬ ঈসায়ী

রবিঃ আউয়াল - রবিঃ সানি ১৪৪৮ হিজরী

ভাদ্র - আশ্বিন ১৪৩৩ বাংলা

বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীসের গবেষণামূলক মুখপত্র

مجلة البحوث العلمية الناطقة بلسان جمعية أهل الحديث ببنغلاديش

প্রতিষ্ঠাতা: আল্লামা মোহাম্মদ আব্দুল্লাহেল কাফী আল-কোরায়শী (রহ)

কুরআন-সুন্নাহর শাশ্বত বিধান, জীবন-দর্শন ও কার্যক্রমের অকুণ্ঠ প্রচারক

সম্পাদকমণ্ডলীর সভাপতি
অধ্যাপক ডক্টর আব্দুল্লাহ ফারুক

সম্পাদক
শাইখ মুহাম্মাদ হারুন হুসাইন

সহকারী সম্পাদক
শাইখ আব্দুল্লাহ শাহেদ মাদানী

প্রবাস সম্পাদক
শাইখ মুহাম্মাদ আজমাল হুসাইন মাদানী

ব্যবস্থাপক
চৌধুরী মুমিনুল ইসলাম

সহকারী ব্যবস্থাপক
মো: রমযান ভূঁইয়া

উপদেষ্টামণ্ডলী
প্রফেসর এ.কে.এম শামসুল আলম
প্রফেসর ড. দেওয়ান আব্দুর রহীম
আলহাজ্জ মুহাম্মাদ আওলাদ হোসেন
প্রফেসর ড. মো: লোকমান হোসেন
শাইখ সাইফুদ্দীন বেলাল মাদানী
উপাধ্যক্ষ ওবায়দুল্লাহ গযনফর

সম্পাদনা পরিষদ
প্রফেসর ড. মো. ওসমান গনী
শাইখ মুফায্যল হুসাইন মাদানী
প্রফেসর ড. মো: মতিউর রহমান
মো: জামাল হোসেন
ড. মোহাম্মদ হেদায়েত উল্লাহ
শাইখ আব্দুল্লাহিল কাফী মাদানী
মুফতী শাইখ মো: আব্দুর রঊফ মাদানী
শাইখ ইসহাক বিন এরশাদ মাদানী

যোগাযোগ :
৭৯/ক/৩, উত্তর যাত্রাবাড়ী, ঢাকা-১২০৪
ফোন : +৮৮০২-২২৪৪৫৮৫৫১
ব্যবস্থাপক : ০১৯১৬-৭০০৮৬৬
মোবাইল : ০১৯৩৩-৩৫৫৯০৮ (অফিস)

সার্কুলেশন বিভাগ
বিকাশ: ০১৯৩৩-৩৫৫৯০৮

ই-মেইল : tarjumanulhadeethbd@gmail.com
www.jamiyat.org.bd
https://www.facebook.com/tarjumanulhadeeth

মূল্য : ২৫/- [পঁচিশ টাকা মাত্র]

মাসিক

مجلة ترجمان الحديث الشهرية

তর্জুমানুল হাদীস

রেজি নং ডি.এ.১৪২

বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীসের গবেষণামূলক মুখপত্র

مجلة البحوث العلمية الناطقة بلسان جمعية أهل الحديث ببنغلاديش

প্রতিষ্ঠাতা: আল্লামা মোহাম্মদ আব্দুল্লাহেল কাফী আল-কোরায়শী (রহ)

কুরআন-সুন্নাহর শাশ্বত বিধান, জীবন-দর্শন ও কার্যক্রমের অকুণ্ঠ প্রচারক

تصدر من مكتب جمعية أهل الحديث ببنغلاديش، ٩٨ شارع نواب فور، داكا- ١١٠٠

الهاتف : ٢٢٤٤٥٨٥٥١-٨٨٠٢+ الجوال : ٠١٧٦١٨٩٧٠٧٦

المؤسس: العلامة محمد عبد الله الكافى القريشي (رحمه الله تعالى)،

المشرف العام للمجلة: الأستاذ الدكتور عبد الله فاروق السلفي،

رئيس التحرير: محمد هارون حسين.

গ্রাহক ও এজেন্ট হওয়ার নিয়মাবলী

বছরের যে কোনো সময় গ্রাহক হওয়া যায়। ছয় মাসের কমে গ্রাহক করা হয় না। জেলা জমঈয়তের সুপারিশপত্রসহ প্রতি সংখ্যার জন্য অগ্রীম ৫০/- (পঞ্চাশ টাকা) পাঠিয়ে বছরের যে কোনো সময় এজেন্সি নেয়া যায়। ১০ কপির কমে এজেন্সি দেয়া হয় না। ১০-২৫ কপি পর্যন্ত ২০% ও ২৬-১০০ কপির জন্য ২৫% কমিশন দেয়া হয়। প্রত্যেক এজেন্টকে এক কপি সৌজন্য দেয়া হয়। জামানতের টাকা পত্রিকা অফিসে নগদ অথবা "বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস" সঞ্চয়ী হিসাব নং-২৮৫৬, ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড, নবাবপুর শাখা, ঢাকায় (অন-লাইনে) জমা দিয়ে এজেন্ট হওয়া যায়।

গ্রাহক চাঁদার হার (ডাকমাশুলসহ)

দেশ	বার্ষিক চাঁদার হার	ষান্মাষিক চাঁদার হার
বাংলাদেশ	৩৬০/-	১৮০/-
পাকিস্তান, ভারত, নেপাল, ভুটান, শ্রীলঙ্কা ও মায়ানমার	২০ ইউ.এস. ডলার	১০ ইউ.এস. ডলার
সাউদী আবর, ইরাক, ইরান, কুয়েতসহ মধ্য প্রাচ্যের দেশসমূহ ও সিঙ্গাপুর	২৫ ইউ.এস. ডলার	১২ ইউ.এস. ডলার
ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া, ব্রুনাইসহ এশিয়ার অন্যান্য দেশসমূহ	২২ইউ.এস. ডলার	১১উ.এস. ডলার
আমেরিকা, কানাডা, অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ডসহ পশ্চিমা দেশসমূহ	৩৫ ইউ.এস. ডলার	১৮ ইউ.এস. ডলার

বিজ্ঞাপনের হার

শেষ প্রচ্ছদ পূর্ণ পৃষ্ঠা	১০, ০০০/-
শেষ প্রচ্ছদ অর্ধ পৃষ্ঠা	৬০০০/-
৩য় প্রচ্ছদ পূর্ণ পৃষ্ঠা	৭০০০/-
৩য় প্রচ্ছদ অর্ধ পৃষ্ঠা	৪০০০/-
সাধারণ পূর্ণ পৃষ্ঠা	৪০০০/-
সাধারণ অর্ধ পৃষ্ঠা	২৫০০/-
সাধারণ সিকি পৃষ্ঠা	১২০০/-

সূচিপত্র

সম্পাদকীয়

❖ ইলমে হাদীসে ইমাম বুখারী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি)-এর অবদান.............৩

দারসুল কুরআন

❖ আল্লাহর ফযল ও রহমতেই প্রকৃত আনন্দ।.........................৪
শাইখ মুহাম্মদ ইব্রাহিম মাদানী

দারসুল হাদীস

❖ সালাম আদান প্রদানের গুরুত্ব ও তার নিয়মাবলী..............৭
শাইখ মো ঃ ঈসা মিঞা

প্রবন্ধ :

❖ সালাফ চরিত।..১০
শাইখ আব্দুল্লাহ শাহেদ আল-মাদানী

❖ ইসলামিয় দাওয়াহর রূপরেখা, গুরুত্ব ও ফযীলত।.............১৩
ড. রেজাউল করিম মাদানী

❖ তাক্বওয়াই মু'মিনের উভয় জগতের উত্তম পাথেয়।............১৭
শাইখ মো: সাইফুল ইসলাম মাদানী

❖ মুদ্রা ব্যবসায়-এর বিধান।....................................২১
মুফতী শাইখ মো: আব্দুর রউফ বিন আইয়ুব আলী মাদানী

❖ কুরআনবাদের স্বরূপ সন্ধান ও সংশয় নিরসন।..................২৫
শাইখ আব্দুল মুমিন বিন আব্দুল খালিক্ব

❖ উমার ফারুক (রা)-কে আল্লাহ তা'আলা যেভাবে সম্মানিত করছেন। .৩০
অধ্যাপক মোঃ আবুল খায়ের

❖ কৃতজ্ঞতাবোধ : একটি মহৎ গুণ।............................৩২
শাইখ ড. আব্দুল্লাহ বিন খোরশেদ

শুব্বান পাতা

❖ সাহাবীদের মাঝে মতভিন্নতার ক্ষেত্রে পারস্পরিক শিষ্টাচার (প্রেক্ষিত : ওমর ইবনুল খাত্তাব ও খালিদ বিন ওয়ালিদ..........৩৭
তানযীল আহমাদ

❖ ফাতাওয়া ও মাসায়েল।...৪২

সম্পাদকীয় الافتتاحية

ইলমে হাদীসে ইমাম বুখারী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি)-এর অবদান

ইসলামী জ্ঞানভাণ্ডারের অন্যতম মৌলিক উৎস হলো হাদীস। কুরআনুল কারিমের পর রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর বাণী, কর্ম, অনুমোদন ও জীবনাদর্শই মুসলিম উম্মাহর জন্য দ্বীনের ব্যাখ্যা ও বাস্তব প্রয়োগের প্রধান পথনির্দেশ। এ অমূল্য ঐতিহ্য সংরক্ষণে যেসব মুহাদ্দিস যুগান্তকারী ভূমিকা পালন করেছেন, তাঁদের মধ্যে ইমাম আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনু ইসমাঈল আল-বুখারী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) সর্বশ্রেষ্ঠদের অন্যতম। তাঁর নাম উচ্চারিত হলেই ইলমে হাদীসের বিশুদ্ধতা, সতর্কতা, গবেষণা ও আমানতদারিতার এক উজ্জ্বল অধ্যায় আমাদের সামনে ভেসে ওঠে।

ইমাম বুখারী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) ১৯৪ হিজরিতে বুখারায় জন্মগ্রহণ করেন। শৈশব থেকেই তিনি হাদীসের প্রতি গভীর অনুরাগী ছিলেন। জ্ঞানার্জনের জন্য তিনি তৎকালীন ইসলামী বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলে দীর্ঘ সফর করেন এবং অসংখ্য শায়খের কাছ থেকে হাদীস সংগ্রহ করেন। তাঁর এ সফর ছিল নিছক জ্ঞান সংগ্রহের জন্য নয়; বরং প্রতিটি বর্ণনার সনদ, রাবির চরিত্র, স্মৃতিশক্তি ও নির্ভরযোগ্যতা যাচাইয়ের এক অসাধারণ গবেষণামূলক প্রচেষ্টা।

ইমাম বুখারী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি)-এর সর্বশ্রেষ্ঠ অবদান হলো 'আল-জামিউস সহীহ', যা সাধারণভাবে 'সহীহ বুখারী' নামে পরিচিত। হাদীসের বিশুদ্ধতা যাচাইয়ের ক্ষেত্রে তিনি এমন কঠোর নীতি অনুসরণ করেছেন, যা তাঁকে অনন্য মর্যাদায় অধিষ্ঠিত করেছে। দীর্ঘ গবেষণা, অসংখ্য রাবির জীবনী পরীক্ষা এবং সনদের সূক্ষ্ম যাচাইয়ের পর তিনি তাঁর গ্রন্থে হাদীস সংকলন করেন। মুসলিম উম্মাহর কাছে সহীহ বুখারী কুরআনের পর সর্বাধিক নির্ভরযোগ্য গ্রন্থ হিসেবে বিশেষ মর্যাদা লাভ করেছে।

তাঁর অবদানের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো হাদীস যাচাইয়ের বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির বিকাশ। তিনি শুধু বর্ণনার বাহ্যিক গ্রহণযোগ্যতার ওপর নির্ভর করেননি; বরং রাবির বিশ্বস্ততা, স্মৃতিশক্তি, সমকালীনতা এবং বর্ণনাকারীদের পারস্পরিক সাক্ষাতের সম্ভাবনাসহ নানা বিষয় বিবেচনা করেছেন। ফলে তাঁর সংকলন হাদীসশাস্ত্রে সমালোচনামূলক গবেষণার এক অনন্য দৃষ্টান্তে পরিণত হয়েছে।

ইমাম বুখারী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি)-এর আত-তারীখুল কাবীরসহ অন্যান্য গ্রন্থও হাদীসের রাবিদের জীবনী ও জারহ-তাদীলের ক্ষেত্রে অসামান্য অবদান রেখেছে। তাঁর গবেষণা পরবর্তী মুহাদ্দিসদের জন্য শক্তিশালী ভিত্তি তৈরি করেছে। মুসলিম বিশ্বের অসংখ্য আলেম তাঁর পদ্ধতি অনুসরণ করে হাদীসের সনদ ও রাবিদের সম্পর্কে গবেষণা করেছেন।

তাঁর জীবনের সবচেয়ে শিক্ষণীয় দিক ছিল ইখলাস, তাকওয়া, জ্ঞানপিপাসা ও আমানতদারি। হাদীসের মতো পবিত্র আমানত সংরক্ষণে তিনি ব্যক্তিগত স্বার্থ, আরাম-আয়েশ ও পার্থিব সুবিধাকে কখনো প্রাধান্য দেননি। তাঁর জীবন প্রমাণ করে- একজন আলেমের প্রকৃত মর্যাদা শুধু তাঁর জ্ঞানের পরিমাণে নয়; বরং জ্ঞান অর্জন, সংরক্ষণ ও প্রচারের ক্ষেত্রে তাঁর নিষ্ঠা ও আল্লাহভীতির মধ্যেও নিহিত।

আজকের যুগে যখন তথ্যের অবাধ প্রবাহের পাশাপাশি যাচাইহীন বক্তব্য ও দুর্বল বর্ণনাও দ্রুত ছড়িয়ে পড়ছে, তখন ইমাম বুখারী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি)-এর গবেষণাপদ্ধতি আমাদের জন্য বিশেষভাবে প্রাসঙ্গিক। কোনো বক্তব্য শুধু প্রচলিত বা আকর্ষণীয় হলেই গ্রহণযোগ্য নয়; বরং তার উৎস, প্রমাণ, বর্ণনাকারী ও নির্ভরযোগ্যতা যাচাই করা জরুরি- ইমাম বুখারী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি)-এর জীবন ও কর্ম আমাদের এ শিক্ষা দেয়।

সুতরাং ইমাম বুখারী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) শুধু একজন হাদীস সংকলক নন; তিনি হাদীস সংরক্ষণ ও গবেষণার ইতিহাসে এক যুগান্তকারী ব্যক্তিত্ব। তাঁর অক্লান্ত সাধনা, অসাধারণ স্মৃতিশক্তি, গবেষণামূলক মনন এবং তাকওয়াপূর্ণ জীবন মুসলিম উম্মাহর জন্য চিরন্তন অনুপ্রেরণা। ইলমে হাদীসের আকাশে তাঁর অবদান এমন এক দীপ্তিমান নক্ষত্র, যার আলো যুগের পর যুগ আলেম ও তালিবুল ইলমদের পথ দেখিয়ে যাবে। তাঁর প্রতি আমাদের প্রকৃত সম্মান হলো তাঁর সংকলিত হাদীস অধ্যয়ন করা, সহীহ সুন্নাহকে জীবনে ধারণ করা এবং নির্ভরযোগ্য জ্ঞান পরবর্তী প্রজন্মের কাছে আমানতের সঙ্গে পৌঁছে দেয়া।❑

দারসুল কুরআন/ من دروس القرآن

আল্লাহর ফযল ও রহমতেই প্রকৃত আনন্দ

শাইখ মুহাম্মাদ ইব্রাহিম মাদানী ❖
পিএইচডি, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া

সমস্ত প্রশংসা জ্ঞাপন করছি মহান আল্লাহর জন্য এবং সালাত ও সালাম পেশ করছি প্রিয় নবী ও প্রিয় রাসূল ﷺ-এর ওপর এবং তাঁর পরিবার ও সাথীদের ওপর। অতঃপর আজকের দারসুল কুরআন-এ সূরা ইউনুস ৫৮ আয়াত থেকে আলোচনা করবো ইনশাআল্লাহ।

قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَٰلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ.

অর্থ : 'বলুন, আল্লাহর অনুগ্রহ ও তাঁর রহমতের কারণেই যেন তারা আনন্দিত হয়। তারা যা সঞ্চয় করে, এটি তার চেয়ে উত্তম'।

ব্যাখ্যামূলক অনুবাদ : হে রাসূল! আপনি সকল মানুষকে বলে দিন-আল্লাহর অনুগ্রহ ও তাঁর রহমতের কারণে তারা যেন আনন্দিত হয়। আল্লাহর অনুগ্রহ ও রহমত বলতে বোঝানো হয়েছে- আল্লাহর পক্ষ থেকে তাদের কাছে আগত হিদায়াত এবং সত্য দ্বীন, আর সেটি হলো ইসলাম। সুতরাং তারা যেন এ নিয়েই আনন্দিত হয়। কারণ, আল্লাহ যে ইসলামের দিকে তাদের আহ্বান করেছেন এবং মুহাম্মদ ﷺ-এর ওপর যে কুরআন অবতীর্ণ করেছেন, তা তাদের সঞ্চিত দুনিয়ার ক্ষণস্থায়ী ভোগ-বিলাস ও নশ্বর সম্পদের চেয়ে অনেক উত্তম।

কিছু অসৎ আলেম যাদের পরিপূর্ণ সহীহ হাদীসের জ্ঞান নেই তারা এ আয়াত দিয়ে রাসূলের জন্মদিনকে কেন্দ্র করে অনুষ্ঠান করা প্রমাণের অপচেষ্টা চালিয়েছে। তাদের এ অপচেষ্টা নিতান্তই ভ্রষ্টতা।

❖ফাতাওয়া ও গবেষণাবিষয়ক সেক্রেটারী, বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস ও দাঈ, ধর্ম মন্ত্রণালয় সৌদি আরব, বাংলাদেশ অফিস।

সম্মানিত পাঠক!

মানুষ স্বভাবগতভাবেই আনন্দপ্রিয়। জীবনে যখন কোনো সফলতা আসে, কোনো সুসংবাদ পাওয়া যায়, প্রিয়জনের সঙ্গে মিলন হয়, অর্থ-সম্পদ অর্জিত হয় কিংবা কোনো কাঙ্ক্ষিত বিষয় লাভ হয়- তখন মানুষ আনন্দিত হয়। কিন্তু কুরআন আমাদের শেখায়, সব আনন্দ একরকম নয় এবং সব আনন্দ কল্যাণকরও নয়।

কেউ সম্পদ পেয়ে আনন্দিত হয়, কেউ পদমর্যাদা পেয়ে, কেউ নিজের সৌন্দর্য্য নিয়ে, কেউ সন্তান-সন্ততি নিয়ে, আবার কেউ দুনিয়ার সামান্য সফলতাকে জীবনের চূড়ান্ত অর্জন মনে করে।

কিন্তু মুমিনের আনন্দের কেন্দ্র হলো ভিন্ন। তার সবচেয়ে বড় আনন্দ হলো- আল্লাহ তাকে ঈমান দিয়েছেন, কুরআন দিয়েছেন, হিদায়াত দিয়েছেন, রাসূল ﷺ-এর সুন্নাহ অনুসরণের তাওফিক দিয়েছেন এবং তাঁর রহমতের দরজা খুলে দিয়েছেন।

এ জন্যই আল্লাহ তা'আলা বলেন :

﴿قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَٰلِكَ فَلْيَفْرَحُوا﴾

'বলুন, আল্লাহর অনুগ্রহ ও তাঁর রহমতের কারণেই যেন তারা আনন্দিত হয়'।

১. আল্লাহর ফযল ও রহমত বলতে কী বোঝায়?

মুফাসসিরগণ এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেছেন, এখানে আল্লাহর فضل এবং রহমত অত্যন্ত ব্যাপক অর্থ বহন করে। এর মধ্যে বিশেষভাবে আল্লাহর পক্ষ থেকে নাযিলকৃত কুরআন, ঈমান, ইসলাম, হিদায়াত এবং সত্যের জ্ঞান অন্তর্ভুক্ত।

এর পরের আয়াতেই আল্লাহ বলেন :

﴿قَدْ جَاءَتْكُمْ مَّوْعِظَةٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِّمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ﴾

'হে মানুষ! তোমাদের রবের পক্ষ থেকে তোমাদের কাছে এসেছে উপদেশ, অন্তরের ব্যাধির নিরাময় এবং মুমিনদের জন্য হিদায়াত ও রহমত'।[১]

[১] সূরা ইউনুস আয়াত : ৫৭।

খেয়াল করুন, ৫৭ নম্বর আয়াতে আল্লাহ কুরআনকে 'মাওয়িযাহ', 'শিফা', 'হিদায়াত' ও 'রহমত' বলেছেন। এরপর ৫৮ নম্বর আয়াতে বলেছেন : فَبِـذَلِكَ فَلْيَفْرَحُـوا 'অতএব, এর কারণেই তারা আনন্দিত হোক'।

অর্থাৎ একজন মুমিনের সবচেয়ে বড় আনন্দের বিষয় হলো কুরআন ও হিদায়াতের নিয়ামত লাভ করা।

২. ঈমান-আল্লাহর সবচেয়ে বড় নিয়ামত :

আমরা পৃথিবীতে কত নিয়ামতকে মূল্যবান মনে করি! অর্থ, বাড়ি, গাড়ি, ব্যবসা, চাকুরি, সন্তান, স্বাস্থ্য- এসব অবশ্যই আল্লাহর নিয়ামত। কিন্তু এগুলোর কোনোটিই ঈমানের সমতুল্য নয়।

আল্লাহ তা'আলা বলেন :

﴿بَلِ اللَّهُ يَمُنُّ عَلَيْكُمْ أَنْ هَدَاكُمْ لِلْإِيمَانِ﴾

'বরং আল্লাহই তোমাদের প্রতি অনুগ্রহ করেছেন যে, তিনি তোমাদের ঈমানের দিকে হিদায়াত দিয়েছেন'।[২]

তাই একজন মানুষ যদি পৃথিবীর সব সম্পদের মালিক হয় কিন্তু ঈমান না থাকে, তবে প্রকৃত অর্থে সে সফল নয়। আর কোনো মানুষ যদি দুনিয়ার সম্পদে দরিদ্র হয়, কিন্তু ঈমান, তাকওয়া ও সৎ আমলের অধিকারী হয়, তবে সে আল্লাহর কাছে সফল।

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন :

مَنْ يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ.

'আল্লাহ যার কল্যাণ চান, তাকে দ্বীনের গভীর জ্ঞান দান করেন'।[৩]

সুতরাং দ্বীনের জ্ঞান অর্জনের সুযোগ পাওয়া, কুরআন শেখা, হাদীস শেখা এবং সুন্নাহ অনুযায়ী জীবন পরিচালনা করার তাওফিক- এগুলো এমন নিয়ামত, যার জন্য আমাদের অন্তর থেকে আনন্দিত হওয়া উচিত।

৩. প্রকৃত আনন্দ দুনিয়ার সম্পদে নয় :

আল্লাহ বলেন :

﴿هُوَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ﴾

'তারা যা সঞ্চয় করে, এটি তার চেয়ে উত্তম'।

মানুষ সারাজীবন সম্পদ সংগ্রহ করে, বাড়ি বানায়, জমি কেনে, ব্যাংকে টাকা রাখে, ব্যবসা করে, ভবিষ্যতের জন্য সঞ্চয় করে। কিন্তু আল্লাহ বলছেন- 'যে ঈমান, হিদায়াত ও রহমত আমি দিয়েছি, তা তোমাদের সঞ্চিত সম্পদের চেয়ে উত্তম'।

আল্লাহ অন্যত্র বলেন :

الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا

'ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি দুনিয়ার জীবনের সৌন্দর্য; কিন্তু স্থায়ী সৎকর্ম তোমার রবের কাছে সওয়াবের দিক থেকে উত্তম এবং প্রত্যাশার দিক থেকেও উত্তম'।[৪]

অর্থাৎ সম্পদ থাকবে না, সন্তান থাকবে না, বাড়ি থাকবে না, পদমর্যাদা থাকবে না- একদিন সবকিছু ছেড়ে চলে যেতে হবে। কিন্তু ঈমান ও সৎ আমলের প্রতিদান আখিরাতে মানুষের সঙ্গে থাকবে।

৪. আল্লাহর রহমত পাওয়াই প্রকৃত সফলতা :

আল্লাহ বলেন :

﴿وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ-﴾

'আমার রহমত সবকিছুকে পরিব্যাপ্ত করে আছে। অতএব আমি তা তাদের জন্য লিখে দেব যারা তাকওয়া অবলম্বন করে, যাকাত দেয় এবং আমার আয়াতসমূহে ঈমান রাখে'।[৫]

মুমিনের জীবনের সবচেয়ে বড় আশা হলো আল্লাহর রহমত। সে নিজের আমল নিয়ে অহংকার করে না; বরং আল্লাহর রহমতের ওপর ভরসা করে এবং তাঁর রহমত পাওয়ার জন্য সৎ আমল করে।

আল্লাহ বলেন :

﴿إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِنَ الْمُحْسِنِينَ﴾

'নিশ্চয়ই আল্লাহর রহমত সৎকর্মশীলদের নিকটবর্তী'।[৬]

তাই যে ব্যক্তি আল্লাহর রহমত পেতে চায়, তাকে ঈমান, তাকওয়া, ইবাদত ও সৎকর্মের পথে চলতে হবে।

---

[২] সূরা আল-হুজুরাত আয়াত : ১৭।
[৩] সহীহ বুখারী, সহীহ মুসলিম।
[৪] সূরা আল-কাহফ আয়াত : ৪৬।
[৫] সূরা আল-আ'রাফ আয়াত : ১৫৬।
[৬] সূরা আল-আ'রাফ আয়াত : ৫৬।

৫. আল্লাহর অনুগ্রহে আনন্দিত হওয়া উচিত :

আল্লাহ তা'আলা বলেন : وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ 'আর তোমার রবের নিয়ামতের কথা প্রকাশ কর'।[৭]

এখানে নিয়ামতের কথা বলা মানে অহংকার না করা; বরং আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করা এবং তাঁর নিয়ামতের স্বীকৃতি দেয়া।

একজন মুসলিম যখন বলে, আল-হামদু লিল্লাহ, আল্লাহ আমাকে ঈমান দিয়েছেন; আল-হামদু লিল্লাহ, আমি কুরআন পড়তে পারি; আল-হামদু লিল্লাহ, আল্লাহ আমাকে সালাতের তাওফিক দিয়েছেন; আল-হামদু লিল্লাহ, আল্লাহ আমাকে গুনাহ থেকে তাওবার সুযোগ দিয়েছেন- তখন সে মূলত আল্লাহর নিয়ামতের শুকরিয়া আদায় করছে।

৬. আনন্দের সঠিক মানদণ্ড :

দুনিয়ার মানুষ সাধারণত বলে-

'আমি টাকা পেয়েছি- আমি সফল'।

'আমি বড় পদ পেয়েছি- আমি সফল'।

'আমার বাড়ি হয়েছে- আমি সফল'।

'আমি অনেক সম্পদের মালিক- আমি সফল'।

কিন্তু কুরআনের মানদণ্ড হলো : قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ 'নিশ্চয়ই মুমিনগণ সফল হয়েছে'।[৮]

এরপর আল্লাহ মুমিনদের গুণাবলি উল্লেখ করেছেন- তারা সালাতে বিনয়ী, অনর্থক বিষয় থেকে বিরত, যাকাত আদায়কারী, নিজেদের লজ্জাস্থান সংরক্ষণকারী ইত্যাদি।

অর্থাৎ কুরআনের দৃষ্টিতে প্রকৃত সফলতা হলো ঈমান ও নেক আমল।

৭. এ আয়াত থেকে আমাদের শিক্ষা :

এ মহান আয়াত থেকে আমরা কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা গ্রহণ করতে পারি-

প্রথমত : আল্লাহর সবচেয়ে বড় নিয়ামত হলো ঈমান ও হিদায়াত। তাই এর জন্য সবচেয়ে বেশি আনন্দিত হওয়া উচিত।

দ্বিতীয়ত : কুরআন মানুষের জন্য উপদেশ, অন্তরের রোগের চিকিৎসা, হিদায়াত ও রহমত।

তৃতীয়ত : দুনিয়ার সম্পদ যত বড়ই হোক, তা ঈমান ও আল্লাহর রহমতের তুলনায় তুচ্ছ।

চতুর্থত : আল্লাহর নিয়ামত পেলে অহংকার নয়; বরং শুকরিয়া আদায় করতে হবে।

পঞ্চমত : প্রকৃত আনন্দ হলো এমন আনন্দ, যা মানুষকে আল্লাহর নিকটবর্তী করে।

ষষ্ঠত : ঈমানের ওপর অটল থাকা, কুরআন-সুন্নাহ অনুসরণ করা এবং আল্লাহর রহমতের আশা করা- এটাই মুমিনের জীবনের প্রকৃত সফলতা।

উপসংহার :

প্রিয় ভাইয়েরা!

আমরা আনন্দ করি, কিন্তু আমাদের আনন্দের কারণ কী?

নতুন বাড়ি হলে আনন্দ করি, নতুন গাড়ি হলে আনন্দ করি, ব্যবসায় লাভ হলে আনন্দ করি, সন্তান পরীক্ষায় ভালো করলে আনন্দ করি। এগুলো আনন্দের বৈধ কারণ হতে পারে। কিন্তু আমাদের সবচেয়ে বড় আনন্দ হওয়া উচিত-

'আল-হামদু লিল্লাহ! আল্লাহ আমাকে মুসলিম করেছেন'।

'আল-হামদু লিল্লাহ! আল্লাহ আমাকে ঈমান দিয়েছেন'।

'আল-হামদু লিল্লাহ! আল্লাহ আমাকে কুরআন দিয়েছেন'।

'আল-হামদু লিল্লাহ! আল্লাহ আমাকে রাসূল ﷺ-এর সুন্নাহ অনুসরণের তাওফিক দিয়েছেন'।

কারণ আল্লাহ সুস্পষ্টভাবে বলেছেন :

﴿قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ﴾

'বলুন, আল্লাহর অনুগ্রহ ও তাঁর রহমতের কারণেই তারা আনন্দিত হোক; তারা যা সঞ্চয় করে, এটি তার চেয়ে উত্তম'।

আল্লাহ আমাদেরকে ঈমানের নিয়ামতের প্রকৃত মূল্য বোঝার, কুরআন ও সুন্নাহকে আঁকড়ে ধরার, তাঁর সকল নিয়ামতের শুকরিয়া আদায় করার এবং তাঁর রহমত লাভের তাওফিক দান করুন।❑❑

[৭] সূরা আদ-দুহা আয়াত : ১১।
[৮] সূরা আল-মুমিনূন আয়াত : ১।

দারসুল হাদীস/ من أحاديث الرسول

সালাম আদান প্রদানের গুরুত্ব ও তার নিয়মাবলী

শাইখ মোঃ ঈসা মিঞা ❖

عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : السَّلَامُ عَلَيْكُمْ، فَرَدَّ عَلَيْهِ السَّلَامَ، ثُمَّ جَلَسَ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : «عَشْرٌ» ثُمَّ جَاءَ آخَرُ فَقَالَ : السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ، فَرَدَّ عَلَيْهِ، فَجَلَسَ، فَقَالَ : «عِشْرُونَ» ثُمَّ جَاءَ آخَرُ فَقَالَ : السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ، فَرَدَّ عَلَيْهِ، فَجَلَسَ، فَقَالَ : «ثَلَاثُونَ»

ইমরান ইবনু হুসাইন (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : এক লোক নাবী ﷺ-এর নিকট এসে বললো, আসসালামু আলাইকুম। তিনি তাঁর সালামের জবাব দিলেন। অতঃপর লোকটি বসলো। তখন নাবী ﷺ বললেন : দশ (নেকী) এরপর আরেকজন এসে বললো, আসসালামু আলাইকুম ওয়া রহমাতুল্লাহ। নাবী ﷺ তাঁর জবাব দিলেন। অতঃপর লোকটি বসলে নাবী ﷺ বললেন : বিশ (নেকী)। এরপর আরেকজন এসে বললেন : আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। নাবী ﷺ তার জবাব দিলেন। অতঃপর লোকটি বসলো। নাবী ﷺ বললেন: ত্রিশ (নেকী)।[৭]

রাবী পরিচিতি :

নাম : ইমরান, উপনাম : আবূ নুজাইদ, পিতার নাম : হুসাইন ইবনু উবায়দ ইবনু খালাফ খুযায়ী। বিশিষ্ট সাহাবী। সপ্তম হিজরী সালে খায়বার যুদ্ধের সময় তিনি ও তার পিতা এবং আবু হুরায়রাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) একই সাথে ইসলাম গ্রহণ করেন। তিনি নাবী ﷺ-এর সাথে একাধিক যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। তার বর্ণিত হাদীস সংখ্যা ১৮০টি। তন্মধ্যে ৯টি মুত্তাফাক আলাইহি। ইমাম বুখারী এককভাবে তার থেকে চারটি হাদীস বর্ণনা করেছেন। আর ইমাম মুসলিম এককভাবে বর্ণনা করেছেন নয়টি হাদীস। তিনি স্বয়ং নাবী ﷺ থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন। তাছাড়া সাহাবাগণের মধ্য থেকে আবূ বকর, উমার ইবনুল খাত্তাব এবং উসমান ইবনু আফফান (রাযিয়াল্লাহু আনহু) প্রমুখ থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন।

তার কাছ থেকে যারা হাদীস বর্ণনা করেছেন তাদের মধ্যে অন্যতম হচ্ছেন- মুতাররিফ ইবনু আব্দুল্লাহ ইবনু শিখখীর, আবূ রাযা আল উতারিদী, যাহদাম আল জারমী, যরারাহ ইবনু আওফা, হাসান আল-বাসরী, ইবনু সীরীন, আব্দুল্লাহ ইবনু বুরায়দাহ, আশ'বী, 'আতা মাওলা ইমরান ইবনু হুসাইন এবং আল-হাকাম ইবনুল আ'রাজ প্রমুখ রহিমাহুমুল্লাহু আজমাঈন।

প্রশাসনিক কাজে ইমরান ইবনু হুসায়ন : তিনি বসরার কাজী হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। উমার ইবনুল খাত্তাব (রাযিয়াল্লাহু আনহু) তাকে বাসরাবাসীদের শিক্ষক হিসেবে প্রেরণ করেন, যাতে তিনি তাদেরকে দীন শিক্ষা দিতে পারেন। হাসান আল-বাসরী শপথ করে বলতেন : বসরাবাসীদের জন্য তাঁর চাইতে কোনো উত্তম ব্যক্তি আর আগমন করেননি। তিনি সকল প্রকার ফিতনা থেকে মুক্ত ছিলেন। এমনকি তিনি ফিতনার আশঙ্কায় আলী ইবনু আবু তালিবের সঙ্গী হয়েও যুদ্ধ করেননি। তিনি ৫২ হিজরী সালে মৃত্যুবরণ করেন।

হাদীসের ব্যখ্যা :

আগন্তুক ব্যক্তি রাসূল ﷺ-কে লক্ষ্য করে বললেন : আসসালামু আলাইকুম। তখন রাসূল ﷺ وعليكم السلام বলে তার সালামের জবাব দিলেন আর বললেন : দশ নেকী। অর্থাৎ লোকটি সালাম দেয়ার বিনিময়ে দশ নেকী অর্জন করলেন। : فجاء آخر فقال السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ، فَرَدَّ عَلَيْهِ এরপর আরেক ব্যক্তি এসে বললেন : আসসালামু আলাইকুম ওয়া

❖ *মুহাদ্দিস, মাদরাসা মুহাম্মাদিয়া আরাবিয়া, যাত্রাবাড়ী, ঢাকা।*

[৭] আবূ দাউদ হা : ৫১৯৫, তিরমিযী হা : ২৬৮৯/২৮২৯।

রহমাতুল্লাহ। রাসূল ﷺ তার জওয়াব দিলেন এ বলে : ওয়া আলাইকুমুস সালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহ। এরপর বললেন : বিশ নেকী। অর্থাৎ, সালামের সাথে ওয়া রাহমাতুল্লাহ যোগ করার কারণে লোকটির বিশ নেকী অর্জিত হলো। এরপর তৃতীয় ব্যক্তি এসে বললেন : السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ রাসূলুল্লাহ ﷺ তার জবাবে বললেন : ওয়া আলাইকুমুস সালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। অতঃপর বললেন : ثلاثون ত্রিশ নেকী। অর্থাৎ লোকটি ওয়া বারাকাতুহু যোগ করার ফলে তার ত্রিশ নেকী অর্জিত হল। এ থেকে জানা গেল যে, সালামের সর্বনিম্ন শব্দ হলো السَّلَامُ عَلَيْكُمْ এবং সর্বোচ্চ অর্থাৎ পূর্ণাঙ্গ সালাম হলো السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ আর তা থেকে এটাও জানা গেল যে, শব্দ কম হওয়ার কারণে সাওয়াব কম আর সালামের শব্দ বেশি ব্যবহার করলে সাওয়াব বেশি পাওয়া যায়।

'ওয়া বারাকাতুহু' বলার পরে কি আরো শব্দ যোগ করা যায়? এক্ষেত্রে বলা যায়, কিছু কিছু বর্ণনায় ومغفرته ورضوانه এরকম শব্দ বৃদ্ধি করার কথা উল্লেখ থাকলেও বর্ণনাগুলো সবই দুর্বল। যা দলীল হিসেবে গ্রহণযোগ্য নয়।[১০]

অতএব তা যুক্ত করা বিধিসম্মত নয়। সুতরাং এ কথা নির্দ্বিধায় বলা যায়, সালামের সর্বনিম্ন শব্দ হলো السَّلَامُ عَلَيْكُمْ এবং সর্বাধিক শব্দ হলো- السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ

এবার এমন বিষয় নিয়ে আলোচনা করার চেষ্টা করব যা সাধারণভাবে আমাদের সমাজে পরিলক্ষিত হয়। যেমন কোনো এক ব্যক্তি তার কোনো আত্মীয় অথবা পরিচিত ব্যক্তির সাথে সাক্ষাৎ হলে তাকে সালাম প্রদান করার পর সে সালামের জবাব দেয়ার পর পুনরায় সালামদাতাকে লক্ষ্য করে বলে, السَّلَامُ عَلَيْكُمْ অর্থাৎ সালাম গ্রহিতা মনে করছে যে, প্রথমে তার সালাম দেয়া উচিৎ ছিলো। কিন্তু সে প্রথমে সালাম দিতে না পারায় সালামদাতার সালামের জবাব দেওয়ার পর ফওত হয়ে যাওয়া সালাম তাকে পুনরায় প্রদানের মাধ্যমে তার নিজের ভুল শুধরিয়ে নিলো। এ রকমটি করার শরীয়তের বিধান কী?

আমরা বলবো, এ ধরনের আচরণ ইসলামী শরীয়তে অনুমোদিত নয়। কেননা সাহাবাগণ এবং পরবর্তীতে তাবেয়ী ও তাবে' তাবে'ঈদের মধ্যে এ ধরনের আচরণের কোনো নযীর নেই। অতএব নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, এ ধরনের আচরণ ইসলামে নতুন সংযোজন শরীয়াতের ভাষায় যাকে বিদ'আত বলা হয়। আর সকল বিদ'আতই পরিত্যাজ্য। সুতরাং যাদের মধ্যে এ ধরনের অভ্যাস আছে তাদের অবশ্য তা পরিত্যাগ করা উচিৎ।

সালাম দেওয়ার ফযীলত : ইতোমধ্যেই আমরা জানতে পেরেছি যে, সালাম দেওয়ার মাধ্যমে ১০, ২০ অথবা ত্রিশ নেকী অর্জিত হয়। তাছাড়াও আরো অনেক হাদীস রয়েছে যার মাধ্যমে সালাম দেওয়ার ফযীলত অবহিত হওয়া যায়। তন্মধ্যে একটি হাদীস নিম্নরূপ :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَا تَدْخُلُوا الجَنَّةَ حَتَّى تُؤْمِنُوا، وَلَا تُؤْمِنُوا حَتَّى تَحَابُّوا، أَلَا أَدُلُّكُمْ عَلَى أَمْرٍ إِذَا أَنْتُمْ فَعَلْتُمُوهُ تَحَابَبْتُمْ؟ أَفْشُوا السَّلَامَ بَيْنَكُمْ»

আবূ হুরাইরাহ رضي الله عنه থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : সেই সত্তার শপথ যাঁর হাতে আমার প্রাণ! তোমরা জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না যে পর্যন্ত তোমরা ঈমানদার হবে, আর ঈমানদার হতে পারবে না যে পর্যন্ত পরস্পর ভালোবাসা স্থাপন করবে। আমি কি তোমাদেরকে এমন একটি কাজের কথা বলে দিব না, যখন তোমরা তা করবে, তখন তোমাদের মধ্যে ভালোবাসা স্থাপিত হবে। কাজটি হলো তোমরা একে অপরের মধ্যে সালামের প্রসার ঘটাও।[১১]

[১০] তুহফাতুল আহওয়াযী ৭/৪৬৩।

[১১] তিরমিযী হা : ২৬৮৮।

অন্য আরেকটি হাদীসে বর্ণিত হয়েছে :

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلَامٍ، قَالَ: لَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ المَدِينَةَ انْجَفَلَ النَّاسُ إِلَيْهِ، وَقِيلَ: قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ،قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجِئْتُ فِي النَّاسِ لِأَنْظُرَ إِلَيْهِ، فَلَمَّا اسْتَبَنْتُ وَجْهَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَرَفْتُ أَنَّ وَجْهَهُ لَيْسَ بِوَجْهِ كَذَّابٍ وَكَانَ أَوَّلُ شَيْءٍ تَكَلَّمَ بِهِ أَنْ قَالَ: «يَا أَيُّهَا النَّاسُ، أَفْشُوا السَّلَامَ، وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، وَصَلُّوا وَالنَّاسُ نِيَامٌ تَدْخُلُونَ الجَنَّةَ بِسَلَامٍ»

আব্দুল্লাহ ইবনু সালাম (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন মদীনায় আগমন করলেন লোকজন তখন দলে দলে তাঁর নিকট গিয়ে ভিড় জমালো আর বলাবলি করতে লাগলো যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ এসেছেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ এসেছেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ এসেছেন। অতএব তাঁকে দেখার জন্য আমিও লোকদের সাথে উপস্থিত হলাম। আমি রাসূলুল্লাহর চেহারার দিকে তাকিয়ে বুঝতে পারলাম যে, এ চেহারা কোনো মিথ্যুকের চেহারা নয়। তখন তিনি সর্বপ্রথম যে কথা বললেন তা এই- 'হে লোকসকল! তোমরা সালামের প্রসার ঘটাও, খাদ্য দান কর এবং মানুষ ঘুমিয়ে থাকার সময় তোমরা (তাহাজ্জুদ) সালাত আদায় কর। তাহলে তোমরা নিরাপদে জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে'।[১২]

সালাম দেওয়ার হুকুম : একজন মুসলিমের সাথে আরেকজন মুসলিমের সাক্ষাৎ ঘটলে তাকে সালাম দেয়া সুন্নাত। কিন্তু সালামের জবাব দেয়া ওয়াজিব। তবে এক বা একাধিক ব্যক্তি যদি একদল লোককে সালাম প্রদান করেন তাহলে সকলের পক্ষ থেকে একজনের সালামের জবাব দেয়াই যথেষ্ট হবে, যদিও সকলের জওয়াব দেয়া বৈধ।

সালামের জবাব কিভাবে দিবে? সালাম প্রদানকারী যতটুকু শব্দ বলে সালাম প্রদান করেছে : জবাবদাতার কমপক্ষে ততটুকু শব্দ বলে জবাব দিতে হবে। জবাবদাতা যদি কিছু শব্দ বাড়িয়ে বলে তবে তা হবে উত্তম। মহান আল্লাহ বলেন :

﴿وَإِذَا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا﴾

'যখন তোমাদের অভিবাদন জানিয়ে সালাম দেয়া হয় তখন তোমরা তার চেয়ে উত্তমভাবে অভিবাদন জানাও অথবা তোমরা ততটুকু ফেরত দাও যতটুকু তারা বলেছে'।[১৩] তবে সালামের জবাব দেয়ার পর সালাম প্রদানকারীকে পুনরায় সালাম দেয়া ইসলামের বিধান নয়, বিধায় তা পরিত্যাজ্য।

কে আগে সালাম দিবে : সালাম প্রদানের স্বাভাবিক নিয়ম হল ছোট বড়কে সালাম দেবে। দাঁড়ানো ব্যক্তি বসা ব্যক্তিকে, আরোহী পদযাত্রীকে, একজন একাধিক ব্যক্তিকে, ছোট দল বড় দলকে, ঘরে প্রবেশকারী ব্যক্তি ঘরে অবস্থানকারী ব্যক্তিদের সালাম প্রদান করবে। তবে শিক্ষা প্রদান করার উদ্দেশ্যে বড় ছোটকে সালাম দিতে পারেন। যাতে শিশুরা বড়দের কাছ থেকে সালাম প্রদানের পদ্ধতি শিখতে পারে।

অত্র দারসের শিক্ষা :

১। সালাম প্রদান করা সুন্নাত।

২। সালামের জবাব দেওয়া ওয়াজিব।

৩। সালামের শব্দ যত বেশি হবে সওয়াবও তত বেশি হবে।

৪। সালাম দেওয়াতে কমপক্ষে দশ নেকী ও সর্বোচ্চ ত্রিশ নেকী অর্জিত হয়।

৫। যতবার সাক্ষাৎ ঘটবে ততবার সালাম দেওয়া সুন্নাত।

৬। সালামের প্রসারের মাধ্যমে ভালোবাসা অর্জিত হয়।

৭। মুমিন মুমিনকে ভালোবাসলে ঈমান বৃদ্ধি পায়।

৮। অধিক হারে সালাম প্রদান জান্নাত লাভের উপায়।

৯। সালাম আদান প্রদানের মাধ্যমে পরস্পরের মধ্যকার হিংসা বিদ্বেষ দূর হয়।❑❑

[১২] তিরমিযী হা : ২৪৮৫।

[redacted]

প্রবন্ধ / المقالة

সালাফ চরিত

সা'দ বিন আবী ওয়াক্কাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু)

অনুবাদ ও সংগ্রহ : শাইখ আব্দুল্লাহ শাহেদ আল-মাদানী ❖

শেষ পর্ব

সা'দ বিন আবী ওয়াক্কাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) :

কুফার গভর্নর :

আঠারো হিজরি সালে সা'দ কুফার মসজিদ নির্মাণ করেন। ২০ হিজরিতে কুফার লোকেরা সা'দের বিরুদ্ধে উমারের কাছে অভিযোগ করলে তিনি তাকে বরখাস্ত করে তার জায়গায় আম্মার ইবনে ইয়াসিরকে নিযুক্ত করেন। তাদের অভিযোগগুলোর মধ্যে একটি ছিল যে, তিনি ভালোভাবে সালাত পড়েন না। উমার সা'দকে ডেকে পাঠালেন এবং বললেন, হে আবু ইসহাক, এই লোকেরা দাবি করছে যে, আপনি ভালোভাবে সালাত পড়েন না। সা'দ উত্তর দিলেন, আল্লাহর কসম, আমি আল্লাহর রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর মতোই তাদের সালাতে ইমামতি করতাম, এর থেকে কোনো বিচ্যুতি ঘটিয়ে নয়। আমি ইশার সালাত পড়ি প্রথম দুই রাক'আত দীর্ঘ করে এবং শেষের দুই রাক'আত সংক্ষিপ্ত করে। উমার বললেন, হে আবু ইসহাক, আমি আপনার কাছ থেকে এটাই আশা করেছিলাম। এরপর তিনি সা'দের খোঁজখবর নেওয়ার জন্য মুহাম্মদ ইবনে মাসলামাহকে তার সঙ্গে কুফায় পাঠালেন। তিনি প্রতিটি মসজিদ পরিদর্শন করলেন এবং সকলেই তার ভূয়সী প্রশংসা করলেন। এমনকি তিনি বনু আবস গোত্রের একটি মসজিদেও প্রবেশ করলেন। তাদের মধ্যে উসামা ইবনে কাতাদা নামে এক ব্যক্তি ছিল। সে আবু সা'দাহ নামে পরিচিত ছিলো। সে উঠে দাঁড়িয়ে বললো, যেহেতু আপনি আমাদের জিজ্ঞাসা করেছেন, সা'দ সামরিক অভিযান পরিচালনা করেন না, তিনি যুদ্ধলব্ধ সম্পদ সমানভাবে ভাগ করেন না এবং তিনি তার বিচারে ন্যায়পরায়ণ নন। সা'দ উত্তর দিলেন, আল্লাহর কসম, আমি তিনটি জিনিসের দু'আ করব : হে আল্লাহ, যদি তোমার এই বান্দা মিথ্যাবাদী হয় এবং সে শুধু রিয়া ও সুমআ তথা মানুষকে শোনানো ও তাদেরকে সন্তুষ্ট করার জন্য এই কথা বলে থাকে, তাহলে তার বয়স দীর্ঘ করো, তার দারিদ্র্য বৃদ্ধি করো এবং তাকে ফিতনায় নিপতিত করো। পরবর্তীতে দেখা গেলো, লোকটি বয়সের ভারে একেবারে নুইয়ে পড়েছে, চোখের ওপর সাদা ভ্রুগুলো ঝুলে পড়েছে, কূফার মসজিদের দরজায় হাত পেতে ভিক্ষা করছে এবং রাস্তায় মেয়েদের দিকে চোখ টিপে ইশারা করছে। তাকে যদি তার অবস্থা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হতো, তাহলে, সে বলতো, আমি ফিতনায় নিপতিত এক বৃদ্ধ, যার ওপর সা'দের অভিশাপ লেগেছে।

এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে, উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) সা'দকে বরখাস্ত করেছিলেন, তার বিরুদ্ধে নিছক অভিযোগের ভিত্তিতেই। এমনটি নয় যে, অভিযোগ তাঁর কাছে সত্য বলে প্রমাণিত হয়েছিল। বরং অভিযোগগুলোর কোনো ভিত্তিই ছিল না। তারপরও তিনি তাকে বরখাস্ত করেছিলেন কেবল মুসলিমদের ঐক্য ঠিক রাখার জন্য। তিনি তার বরখাস্তের মাধ্যমে মুসলিমদের কল্যাণ চেয়েছিলেন। আর সেটিই বাস্তবায়িত হয়েছে। আল-হামদু লিল্লাহ। অনুরূপভাবে তিনি শাসনক্ষমতা লাভ করার পরপরই সিরিয়া অভিযানের সর্বাধিনায়ক খালিদ বিন ওয়ালীদকেও অপসারণ করেছিলেন। খালিদের অযোগ্যতার কারণে তিনি তাকে বরখাস্ত করেননি; বরং মুসলিমদের কল্যাণেই তিনি এটা করেছিলেন। খালিদের মধ্যে তার অপসারণ কোনো প্রভাব ফেলেনি। বরং তিনি ছিলেন সাধারণ সৈনিক হিসেবে সফল যেমন ছিলেন সেনাপতি হিসেবে সফল।

উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু)'র মৃত্যুর পর শূরা কাউন্সিল :

যখন উমর ইবনুল খাত্তাব (রাযিয়াল্লাহু আনহু) অগ্নিপূজক আবু লুলু দ্বারা ছুরিকাঘাতের শিকার হন এবং এতে তাঁর মৃত্যু আসন্ন হয়, তখন তিনি এই শর্ত আরোপ করেন যে, খেলাফতের বিষয়টি এমন ছয়জন ব্যক্তির মধ্যে আলোচনার মাধ্যমে নিষ্পত্তি হবে, যাঁদের প্রতি নবী

❖ সহকারী সম্পাদক, মাসিক তর্জুমানুল হাদীস, ও মুহাদ্দিস মাদরাসা মুহাম্মাদীয়া আরাবীয়া।

মুহাম্মদ ﷺ তাঁর মৃত্যুর সময় সন্তুষ্ট ছিলেন। তারা হলেন উসমান ইবন আফফান, আলী ইবন আবি তালিব, তালহা ইবন উবায়দুল্লাহ, যুবায়ের ইবনুল আওয়াম, আব্দুর রহমান ইবনে আওফ এবং সা'দ ইবন আবি ওয়াক্কাস। উমর ইবনুল খাত্তাবের দাফন সম্পন্ন হওয়ার পর শূরা পরিষদের সদস্যরা একত্রিত হলেন। সা'দ আব্দুর রহমান বিন আওফকে মনোনীত করেন এবং বললেন, আমি আমার সমস্ত বিষয়টি আব্দুর রহমান ইবন আওফের ওপর অর্পণ করছি। যুবায়ের বললেন, আমি আমার বিষয়টি আলীর ওপর সোপর্দ করলাম। তালহা বললেন, আমি আমার বিষয়টি উসমানের ওপর সোপর্দ করলাম। অতঃপর আব্দুর রাহমান ইবনে আওফ বিষয়টি থেকে নিজেকে সরিয়ে নিলেন এবং মুসলমানদের সাথে পরামর্শ করতে লাগলেন, অবশেষে তাঁরা উসমান ইবনে আফফানের বিষয়ে একমত হলেন।

ফিতনা থেকে তাঁর দূরে থাকা

সা'দ ফিতনা থেকে বিরত ছিলেন। উসমান ইবনে আফফানের হত্যাকাণ্ডের পর তাঁর পুত্র উমার ইবনে সা'দ তাঁকে খিলাফতের জন্য দাবি করতে বললেন। কিন্তু তিনি তা প্রত্যাখ্যান করেন। তাঁর ভাতিজা হাশিম ইবনে উতবাহও একই অনুরোধ করেন। সা'দ যখন তাঁর অস্বীকৃতিতে অটল থাকেন, তখন হাশিম আলীর প্রতি আনুগত্যের শপথ নেন।

ফিতনার (গৃহযুদ্ধ) সময় যারা ঘরে অবস্থান করেছিলেন, সা'দ তাঁদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন। তিনি উটের যুদ্ধ, সিফফিনের যুদ্ধ বা সালিশে অংশগ্রহণ করেননি। তিনি তাঁর পরিবারকে নির্দেশ দিয়েছিলেন যে, মুসলিম জাতি একজন নেতার অধীনে ঐক্যবদ্ধ না হওয়া পর্যন্ত তাঁকে যেন কোনো খবর না জানানো হয়। এই সুযোগ ব্যবহার করে মু'আবিয়া ইবনে আবি সুফিয়ান তার কাছে, আবদুল্লাহ ইবনে উমরের কাছে এবং মুহাম্মদ ইবনে মাসলামার কাছে চিঠি লেখেন এবং উসমানের রক্তের প্রতিশোধ নিতে তাঁকে সাহায্য করার অনুরোধ করেন। তিনি তাদের প্রত্যেককেই বললেন, তাকে হত্যা করা ও তাকে পরিত্যাগ করার কৃতকর্মের প্রায়শ্চিত্ত তারা এভাবেই সম্ভব হবে। অন্যথায় তার হত্যাকারী এবং তার পরিত্যাগকারী একই রকম অপরাধে অপরাধী হবে। তাদের প্রত্যেকেই তার দাবি খণ্ডন করে তার বক্তব্য অস্বীকার করেন এবং তাকে দেখিয়ে দেন যে, সে যা চাচ্ছে তার যোগ্য সে নয়।

সহীহ মুসলিমে বর্ণিত হয়েছে, সা'দ ইবনে আবি ওয়াক্কাস বর্ণনা করেছেন যে, মু'আবিয়া রাযিয়াল্লাহু আনহু সা'দকে আদেশ দিয়ে বললেন, আবু তুরাব (আলী)-কে অভিশাপ দিতে আপনাকে কিসে বাধা দিচ্ছে? সা'দ উত্তর দিলেন, আল্লাহর রাসূল ﷺ আলীর ব্যাপারে তিনটি জিনিসের কথা বলেছেন। এ কারণে আমি তাঁকে গালি দিবো না। সেগুলোর একটি বাস্তবায়ন করা আমার কাছে লাল উটের চেয়েও বেশি প্রিয়। আমি আল্লাহর রাসূল ﷺ তাঁর একটি অভিযানে তাঁকে পিছনে রেখে যাওয়ার সময় বলতে শুনেছি, 'হে আল্লাহর রাসূল, আপনি আমাকে নারী ও শিশুদের সাথে পিছনে ফেলে গেছেন। আল্লাহর রাসূল ﷺ তাঁকে বললেন, তুমি কি আমার কাছে তেমন হতে সন্তুষ্ট নও, যেমন হারুন হয়েছিলেন মুসার কাছে? শুধু পার্থক্য এই যে, আমার পরে আর কোনো নবী নেই। আর আমি খায়বারের দিনে তাঁকে বলতে শুনেছি, আমি পতাকাটি এমন এক ব্যক্তিকে দিবো, যে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে ভালোবাসে এবং যাকে আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলও ভালোবাসেন। তাই আমরা সবাই অপেক্ষা করতে লাগলাম যে, সেটা কাকে দেয়া হবে। তখন তিনি বললেন, আলীকে আমার কাছে ডাকো। অতঃপর তাকে ডেকে আনা হলো। তখন তাঁর চোখে অসুস্থতা ছিল। তিনি তার চোখে থুথু দিলেন। এতে তিনি সুস্থ হয়ে গেলেন। অতঃপর তাকে পতাকাটি দিয়ে দিলেন। আল্লাহ তাকে বিজয় দান করলেন। আর যখন এই আয়াতটি অবতীর্ণ হলো,

﴿تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ﴾

"এসো, আমরা আমাদের পুত্রদের এবং তোমাদের পুত্রদের ডাকি"[১৪] তখন আল্লাহর রাসূল ﷺ আলী,

[১৪] সূরা আল-ইমরান আয়াত : ৬১।

ফাতিমা, হাসান এবং হুসাইনকে ডেকে বললেন, হে আল্লাহ! এরাই আমার পরিবার।[১৫]

সা'দ ইবনে আবি ওয়াক্কাস যখন শুনলেন যে, এক ব্যক্তি আলী, তালহা এবং যুবায়েরের নিন্দা করছে, তখন সা'দ তাকে থামানোর চেষ্টা করে বললেন, আমার ভাইদের নিন্দা করো না। কিন্তু লোকটি বিরত থাকতে রাজি হলো না। অতঃপর সা'দ উঠে দাঁড়ালেন, দুই রাকাত সালাত পড়লেন এবং তার বিরুদ্ধে দু'আ করলেন। তখন ভিড় ঠেলে একটি উট এসে ফুটপাতের ওপর তাকে ধরে ফেলল এবং নিজের কুঁজ ও ফুটপাতের মাঝে এমনভাবে চেপে ধরলো যে, তিনি উটটির দ্বারা পিষ্ট হলেন। সা'দ ইবনুল মুসাইয়্যাব বলেন, আমি দেখলাম লোকেরা সা'দকে অনুসরণ করছে এবং বলছে, হে আবু ইসহাক! আপনাকে অভিনন্দন, আপনার দু'আ কবুল হয়েছে।

সা'দের মৃত্যু : মুহাজিরদের মধ্যে তিনিই ছিলেন সর্বশেষ মৃত্যুবরণকারী সাহাবী। মৃত্যুকালে তিনি তাঁর পুরোনো পশমের চাদরটি চেয়ে নিয়ে বললেন, আমাকে এতে কাফন পরিয়ে দাও। কারণ বদরের যুদ্ধে মুশরিকদের সাথে যুদ্ধ করার সময় আমি এটি পরেই ছিলাম। এটিতে কাফন পরিহিত হবার উদ্দেশ্যেই এটি সংরক্ষণ করে রেখেছি। তিনি মু'আবিয়া ইবনে আবি সুফিয়ানের শাসনামলে ৫৫ হিজরিতে মৃত্যুবরণ করেন অথবা বলা হয়ে থাকে যে, ৫৬ হিজরি বা ৫৭ হিজরিতে। আবু নু'আইম আল-মুলাই বলেছেন ৫৮ হিজরিতে। কিন্তু প্রথমটিই অধিকতর সঠিক। তিনি মদিনা থেকে দশ মাইল দূরে আল-আকিক-এ অবস্থিত তাঁর নিজ বাড়িতে মৃত্যুবরণ করেন। লোকদের কাঁধে করে তাঁকে মদিনায় নিয়ে যাওয়া হয় এবং তৎকালীন মদিনার গভর্নর মারওয়ান ইবনুল হাকাম জানাজার সালাতে ইমামতি করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স সত্তরের কিছু বেশি হয়েছিল। নবী স্ত্রীরা খবর পাঠালেন যে, আমরা তাঁর জানাযায় শরীক হতে বাইরে যেতে পারবো না। নবী ﷺ-এর মসজিদে তাঁর জানাজার সালাত হলে আমরা শরীক হতে পারবো। তাই সাহাবীগণ তার জানাযা মসজিদের ভিতরেই পড়ার ব্যবস্থা করলেন। ফলে নবী ﷺ-এর স্ত্রীগণ তাঁর জানাযায় শরীক হলেন। তাঁকে ইমামের দাঁড়ানোর স্থানের দিকে জানাজার দরজা দিয়ে বের করে আনা হলো। নবীর স্ত্রীদেরকে জানানো হলো যে, লোকেরা এর সমালোচনা করছে এবং বলছে, মসজিদের ভিতরে তো জানাজা আনা হয় না। এই খবর আয়েশা বিনতে আবি বকরের কাছে পৌঁছালে তিনি বললেন, মানুষ যা জানে না, তার সমালোচনা করতে তারা কতই না তৎপর! তারা মসজিদের ভিতরে একটি জানাজার সালাতে আমাদের অংশগ্রহণের কারণে আমাদের সমালোচনা করেছে, অথচ আল্লাহর রাসূল ﷺ সুহাইল ইবনুল বাইযার জানাজা মসজিদের ভিতরে ছাড়া অন্য পড়েননি। সা'দ যেদিন মারা যান, সেদিন তিনি আড়াই লক্ষ দিরহাম রেখে যান। তাঁর সম্পদের একটি নিদর্শন হলো, তিনি যখন তাঁর ব্যক্তিগত সম্পদ মারওয়ান ইবনুল হাকামকে পাঠান, তখন তার যাকাতের পরিমাণ ছিল পাঁচ হাজার দিরহাম।

আমরা আল্লাহর কাছে দু'আ করি, হে আল্লাহ! তোমার এই সৎ বান্দাকে কিয়ামতের দিন নবী-রাসূল, সিদ্দীক, শুহাদা ও সালেহীনদের সাথে শামীল করো এবং আমাদেরকেও তাদের সাথে তোমার সম্মানিত ঘরে একত্রিত করো। আমীন

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন :

خَيْرُ النَّاسِ قَرْنِي، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ يَجِيءُ أَقْوَامٌ تَسْبِقُ شَهَادَةُ أَحَدِهِمْ يَمِينَهُ، وَيَمِينُهُ شَهَادَتَهُ

"সর্বোত্তম যুগ হল আমার (সাহাবীদের) শতাব্দী। অতঃপর তৎপরবর্তী (তাবেয়ীদের) শতাব্দী। অতঃপর তৎপরবর্তী (তাবেতাবেয়ীনদের) শতাব্দী। অতঃপর এমন সম্প্রদায়ের আগমন ঘটবে, যাদের একজনের কসমের আগে সাক্ষি হবে, আবার সাক্ষির আগে কসম হবে।"

(শব্দাবলী সহীহ বুখারীর)

[১৫] সহীহ মুসলিম, হা : ২৪০৪।

সূচিপত্র

ইসলামী দাওয়াহর রূপরেখা, গুরুত্ব ও ফযীলত

ড. রেজাউল করিম মাদানী ❖
পি এইচ ডি, মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়

(পর্ব-৪র্থ)

ইসলামী দাওয়াহর দ্বিতীয় উৎস : সুন্নাহ্ (হাদীসুর রাসূল)

দাওয়াতের বিষয়বস্তু, পদ্ধতি- মাধ্যম ও মানহাজ যেসব উৎস থেকে আহরণ করা হয়, তার মধ্যে অন্যতম হলো সুন্নাহ্ তথা রাসূলের হাদীস।

শাব্দিক অর্থে সুন্নাহ্ হচ্ছে : সুন্নাহ্ মানে হলো চলার পথ বা জীবনধারা– তা ভালো হোক বা মন্দ, প্রশংসণীয় হোক বা নিন্দনীয়। ইবনে মানযূর বলেন :

«السنة: السيرة حسنة كانت أو قبيحة»

“সুন্নাহ্ হলো জীবনধারা, তা সুন্দর হোক বা কুৎসিত।”[১৬]
কুরআনে সুন্নাহ্ শব্দটি ব্যবহার হয়েছে “পথ” অর্থে।

রাগিব আসফাহানী বলেন : “রাসূলের সুন্নাহ্ বলতে তাঁর অবলম্বিত পদ্ধতি বোঝানো হয়। আর আল্লাহর সুন্নাহ্ বলতে তাঁর হিকমতের পথ বা আনুগত্যের পথ বোঝানো হয়।[১৭]

মুহাদ্দিসদের পরিভাষায় সুন্নাহ্ : নবী ﷺ-এর বাণী, কাজ, গুণাবলী, জীবনী, যুদ্ধসমূহ এবং খবর। কিছু আলিম একে সংক্ষিপ্তভাবে সংজ্ঞায়িত করেছেন– নবী ﷺ-এর কথা, কাজ এবং অবস্থানসমূহ।[১৮]

এটি সুস্পষ্ট যে, নবী ﷺ-এর জীবনই প্রকৃত দাওয়াত। সুন্নাহ্-তে দাওয়াতের পদ্ধতি ও মাধ্যম সম্পর্কিত বহু হাদীস উল্লেখ রয়েছে। আর মক্কা ও মদিনায় নবী ﷺ -এর যেসব ঘটনা ঘটেছে এবং তিনি যেভাবে সেগুলো মোকাবিলা করেছেন, সবই দাওয়াতের জন্য অতি সমৃদ্ধ শিক্ষা। কারণ নবী ﷺ এমন সব পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে গেছেন, যেগুলো দাঈগণ যুগে যুগে সম্মুখীন হবে। ফলে কোনো পরিস্থিতি বা সমস্যা নেই যার জন্য নবী ﷺ-এর জীবনে দিকনির্দেশনা পাওয়া যায় না। এ যেন আল্লাহর হিকমত ও দয়া যে, তিনি তাঁর রাসূলকে বিভিন্ন অবস্থা ও পরীক্ষার মধ্যে ফেলেছেন। যাতে মুসলিম দাঈরা বুঝতে পারে কিভাবে আচরণ করতে হবে এবং কিভাবে দাওয়াতি পথ অনুসরণ করতে হবে। তাই নবী ﷺ-এর জীবন ও নির্দেশনা বাস্তবিক উদাহরণ যা আল্লাহ তাঁকে দাওয়াত ও রিসালাতের ব্যাপারে আদেশ করেছেন। এজন্য কোনো দাঈ-এর পক্ষে নবী ﷺ-এর সীরাত থেকে বিমুখ থাকা বৈধ নয়।

সুন্নাহ্কে আঁকড়ে ধরা ও অনুসরণ করা : সালফে সালেহীনগণ (আল্লাহ তাঁদের রহম করুন) ইসলামী নিয়ম-নীতি, বিধি-বিধান ও মূল্যবোধ পূর্ণভাবে মেনে জীবন যাপন করতেন। তাঁরা কথাবার্তায় ও চরিত্রে সুন্নাহ্র প্রতি অটল থাকতেন। তাঁরা নিজেদের মত বা খেয়ালকে কুরআন ও সুন্নাহ্র উপরে প্রাধান্য দিতেন না। বিশেষ করে সাহাবাগণ رضي الله عنهم যারা নবী ﷺ-এর সাথে জীবন কাটিয়েছেন এবং ওহী নাযিল প্রত্যক্ষ করেছেন। তাঁদের অন্তরে গেঁথে গিয়েছিল যে, মুক্তি কেবল কুরআন ও সুন্নাহ্ অনুসরণে। আর ধ্বংস এদুয়ের বিরোধিতায়। তাই তাঁরা এর বাইরে কোনো পথ খুঁজতেন না, কোনো মতামতকে এগুলোর সামনে দাঁড় করাতেন না।

আল্লাহ বলেছেন : যদি তোমরা আল্লাহ ও রাসূলের প্রতি ঈমান রাখো, তবে কোনো বিষয়ে মতবিরোধ হলে তা আল্লাহ ও রাসূলের দিকে ফিরিয়ে দাও...[১৯]

মুফারসিরগণ বলেন : আল্লাহর দিকে ফেরানো মানে কিতাবুল্লাহ্-এর দিকে ফেরানো, আর রাসূলের দিকে ফেরানো মানে সুন্নাহ্-এর দিকে ফেরানো। অতএব, সুন্নাহ্ গ্রহণ করা কুরআনের মতোই অপরিহার্য। দুটোই আল্লাহর ওহী, যা তিনি তাঁর রাসূল ﷺ-এর ওপর অবতীর্ণ করেছেন।

❖ প্রভাষক, ইন্টারন্যাশনাল ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় অব সাইন্স অ্যান্ড টেকনোলোজি বাংলাদেশ।

16 لسان العرب لابن منظور(١٣/ ٢٢٥) .

17 المفردات في غريب القرآن للراغب الأصفهاني(ص ٢٤٩)

18 تدريب الراوي للسيوطي (١/ ٢٧).

19 سورة النساء, الآية: (٥٩)

আল্লাহ বলেন : আর আমরা আপনার প্রতি কিতাব অবতীর্ণ করেছি যাতে আপনি মানুষের কাছে তা পরিষ্কার করে ব্যাখ্যা করেন...[২০]

তাই নবী ﷺ-এর দায়িত্ব হলো কুরআনের সংক্ষিপ্ত বিষয়কে ব্যাখ্যা করা ও বিস্তারিত তুলে ধরা। আল্লাহ সমগ্র সৃষ্টির ওপর তাঁর রাসূলের আনুগত্যকে ফরয করেছেন এবং তা নিজের আনুগত্যের সাথে মিলিয়ে দিয়েছেন। নবী ﷺ-এর বিরোধিতা করার বিরুদ্ধে কঠিন শাস্তির হুঁশিয়ারি দিয়েছেন। আল্লাহ বলেন :

যে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল ﷺ-এর অবাধ্য হবে, নিশ্চয়ই তার জন্য জাহান্নামের আগুন রয়েছে...[২১]

তিনি আরো বলেন : রাসূল তোমাদের যা দেন তা গ্রহণ করো, আর যা থেকে তোমাদের নিষেধ করেন তা থেকে বিরত থাকো....[২২]

এভাবে বহু আয়াতে আল্লাহ তাঁর রাসূল ﷺ-এর আনুগত্যকে নিজের আনুগত্যের সাথে যুক্ত করেছেন, নবীর আদেশকে নিজের আদেশের সমতুল্য করেছেন, আর নবীর বিরোধিতা করাকে কঠোরভাবে নিষেধ করেছেন।

আল্লাহ আমাদেরকে তার মহব্বতের পথে দিকনির্দেশ দিয়েছেন এবং তা হলো নবী ﷺ-কে অনুসরণ করা। তিনি বলেন :

বলুন: যদি তোমরা আল্লাহকে ভালোবাসো তবে আমাকে অনুসরণ করো, তাহলে আল্লাহ তোমাদেরকে ভালোবাসবেন এবং তোমাদের গুনাহ ক্ষমা করবেন..[২৩]

যে তাঁর রাসূলের সুন্নাহ্-কে অনুসরণ করে, আল্লাহ তাকে ভালোবাসেন, ঈমানে অন্তর্দৃষ্টি প্রদান করেন, গুনাহ মাফ করেন এবং সন্তুষ্টি প্রদান করেন।

সুন্নাহ গ্রহণের আবশ্যকতার প্রমাণ : সুন্নাহ গ্রহণের, হাদীস অনুসরণের আবশ্যকতার অনেক দলীল রয়েছে।

যেমন, সাহাবী আল-মিকদাম ইবনে মাআদিকারিব রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন:

« ألا إني أتيت الكتاب ومثله معه ألا يوشك رجل شبعان على أريكته يقول: عليكم بهذا القرآن فما وجدتم في حلال فأحلوه وما وجدتم فيه من حرام فحرموه»

“জেনে নাও! আমাকে কিতাব (কুরআন) দেওয়া হয়েছে এবং এর সাথে এর অনুরূপ (সুন্নাহ) দেওয়া হয়েছে। অচিরেই এক ব্যক্তি পেটভরে খেয়ে তার আরামকেদারায় হেলান দিয়ে বসে বলবে : ‘তোমরা শুধু এ কুরআনকেই আঁকড়ে ধরো; এখানে যা হালাল পাবে তাকে হালাল জানো, আরো যা হারাম পাবে তাকে হারাম জানো[২৪]।

আরো এসেছে ইবনে আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত : বিদায় হজে রাসূলুল্লাহ ﷺ লোকদের উদ্দেশে খুতবা দিয়ে বললেন :

«يا أيها الناس : إني قد تركت فيكم ما إن اعتصتم به فلن تضلوا أبداً , كتاب الله وسنتي»

“হে মানুষ! আমি তোমাদের মাঝে এমন জিনিস রেখে যাচ্ছি, যদি তোমরা সেটাকে আঁকড়ে ধরো তবে কখনোই পথভ্রষ্ট হবে না– আল্লাহর কিতাব এবং আমার সুন্নাহ।

তাছাড়া আরবায ইবনে সারিয়া রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর বিখ্যাত হাদীসে এসেছে :

«فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ, وإياكم ومحدثات الأمور »

“অবশ্যই তোমরা আমার সুন্নাহ এবং হিদায়াতপ্রাপ্ত খলিফাগণের সুন্নাহ আঁকড়ে ধরো এবং তা শক্তভাবে কামড়ে ধরো। আর তোমরা নতুন উদ্ভাবিত বিষয় থেকে সাবধান থাকো।[২৫]

---

[20] سورة النجم, الآية: (٣-٤)

[21] سورة النساء, الآية: (٦٥).

[22] سورة الحشر, الآية: (٧)

[23] سورة آل عمران , الآية: (٣١).

[24] رواه أحمد (١/ ١٢), وأبو داؤود (١٣/٧/ ح: ٤٦٠٤)

[25] رواه أبو داود ١٧/١ رقم: ٦٠٧) والترمذي (٤٤/٥ رقم:٢٦٧٦

সালফে সালেহীন (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) সুন্নাহ অনুসরণ, তার প্রতি দাওয়াত ও উৎসাহ প্রদান করতেন এবং বিদ'আত থেকে নিষেধ ও সতর্ক করতেন। ইবনে মাসউদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেছেন :

«يا أيها الناس عليكم بالعلم قبل أن يرفع ، فإن من رفعه أن يقبض أصحابه، وإياكم والتبدع والتنطع، وعليكم بالعتيق ، فإنه سيكون في آخر هذه الأمة أقوام يزعمون أنهم يدعون إلى كتاب الله، وقد تركوه وراء ظهورهم»

"হে মানুষ! তোমরা জ্ঞান অর্জন করো, এর আগে যে তা তুলে নেওয়া হয়। আর জ্ঞান তুলে নেওয়ার একটি রূপ হলো এর বাহকদের (আলিমদের) মৃত্যু। তোমরা বিদ'আত ও বাড়াবাড়ি থেকে বেঁচে থাকো এবং প্রাচীন (অর্থাৎ কিতাব ও সুন্নাহভিত্তিক) জ্ঞানকে আঁকড়ে ধরো। কারণ এ উম্মতের শেষ সময়ে কিছু লোক আসবে যারা দাবি করবে যে, তারা আল্লাহর কিতাবের দাওয়াত জানায়, অথচ তারা তা নিজেদের পেছনে ফেলে রেখেছে।[২৬]

তিনি আরো বলেছেন : "একদল লোক আসবে যারা সুন্নাহর এক আঙুল সমান অংশ ছেড়ে দেবে। যদি তোমরা তাদের এভাবে ছেড়ে দাও তবে তারা বড় বিপদ বয়ে আনবে। আর পূর্ববর্তী আহলে কিতাবগণও শুরুতেই সুন্নাহ ছেড়ে দিয়েছে। আর তাদের সর্বশেষ যে বিষয় তারা ছেড়েছে তা হলো সালাত। যদি সালাত তাদের কাছে প্রিয় না হতো তবে তারাও সালাত ছেড়ে দিত।"

ইবনে সিরিন (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) বলেছেন : "তারা মনে করতেন, মানুষ সঠিক পথে আছে যতক্ষণ সে 'আসার' (সুন্নাহ ও সাহাবীদের পথ) অনুসরণ করে।"[২৭] অন্য এক বর্ণনায় : "তারা মনে করতেন, মানুষ সঠিক পথে আছে যতক্ষণ সে 'আসার' (অতীতের পথ) ধরে চলে।"

আল-যুহরী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) বলেছেন : «الاعتصام بالسنة نجاة»

"সুন্নাহ আঁকড়ে ধরা হলো মুক্তি।[২৮]

এগুলো থেকে স্পষ্ট হয় যে, সালফে সালেহীন (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) সুন্নাহ আঁকড়ে ধরতে অত্যন্ত যত্নবান ছিলেন এবং বিদ'আত থেকে নিষেধ ও সতর্ক করতেন। এতে প্রমাণিত হয় যে, তাদের কাছে সুন্নাহর মর্যাদা ছিল মহৎ এবং এটি ছিল শরীয়তের অন্যতম প্রধান উৎস। অতএব, দাঈদের উচিত সালফে সালেহীনের পথ অনুসরণ করা– নবী ﷺ-কে অনুসরণে তাদের পথ মেনে চলা। কারণ তাদের পথ পরবর্তীদের চেয়ে অধিক নিরাপদ, অধিক জ্ঞানপূর্ণ এবং অধিক প্রজ্ঞাপূর্ণ। সালাফদের জ্ঞান ছিল বিশুদ্ধ– যা সরাসরি কুরআন ও সুন্নাহ থেকে নেওয়া। কিন্তু পরবর্তীদের জ্ঞানে এসেছে বহিরাগত উপাদান ও মিশ্রণ। সালাফের জ্ঞান স্বচ্ছ, অপরদিকে খলফের জ্ঞানে রয়েছে অনেক বিভ্রান্তি।

অতএব, দাঈদের কর্তব্য হলো মানুষকে নবী ﷺ-এর সুন্নাহ অনুসরণ, তার বিধান মান্য করা এবং মতভেদের ক্ষেত্রে তার দিকে ফিরে যাওয়ার দাওয়াত জানানো; একই সাথে বিদ'আত থেকে বিরত রাখার শিক্ষা দেওয়া।

সুন্নাহকে জীবিত করার উৎসাহ এবং বিদ'আত থেকে সতর্ক করা :

সুন্নাহকে জীবিত করার অর্থ হলো– এমন সময় সুন্নাহ অনুযায়ী আমল করা, যখন মানুষ তা পরিত্যাগ করেছে। এমনিভাবে সুন্নাহকে জীবিত করার অর্থ হচ্ছে, সুন্নাহর জ্ঞান অর্জন, মানুষের মাঝে তা প্রচার করা, শিক্ষা দেওয়া, আমলে উৎসাহিত করা এবং তার বিরোধিতা থেকে সতর্ক ও সাবধান করা। ফাইযুল কাদীর-এ এসেছে : "যে ব্যক্তি একটি সুন্নাহকে জীবিত করে, অর্থাৎ তা শিক্ষা দেয়, সে অনুযায়ী আমল করে, মানুষের মাঝে প্রচার করে, অনুসরণের জন্য উৎসাহিত করে এবং বিরোধিতা থেকে সতর্ক করে– এটাই প্রকৃত সুন্নাহকে জীবিত করা।

সুন্নাহ বলতে, রাসূল ﷺ কর্তৃক প্রবর্তিত শরয়ী বিষয়াবলি বোঝানো হয়। এগুলো কখনো ফরজ হতে পারে, যেমন ফিতরের যাকাত; আবার কখনো অন্য কিছু হতে পারে, যেমন ঈদের দিনের সলাত।

অতএব, মুসলমানের দায়িত্ব হলো নিজের কাজ, কথা ও আচরণে সুন্নাহকে অনুসরণ করা এবং বিদ'আত

---

[26] رواه البيهقي في المدخل (ص:٢٧٢ رقم: ٣٨٨)

[27] رواه ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله(٢/ ٧٦)

[28] رواه ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله(٢/ ١٠٤٩

থেকে বিরত থাকা। কারণ অনেকেই দাবি করে যে তারা সুন্নাহকে জীবিত করছে, অথচ আসলে তারা বিদ‘আত করছে– যার কোনো শরয়ী ভিত্তি নেই। তাই একজন মুসলিমের উচিত রাসূল ﷺ-এর সুন্নাহকে জীবিত করা। কিন্তু তা করার আগে অবশ্যই নিশ্চিত হতে হবে যে, বিষয়টি সত্যিই সুন্নাহ কি না। আর তা জানা যায় জ্ঞান দ্বারা অথবা আলেমদেরকে জিজ্ঞেস করার মাধ্যমে– যাতে বিদ‘আতে পতিত হতে না হয়। কেননা রাসূল ﷺ বিদ‘আত সম্পর্কে সতর্ক করেছেন, এগুলো পথভ্রষ্টতা এবং নববী হিদায়াত থেকে বিচ্যুতি।

রাসূল ﷺ খুতবায় এত জোরে বলতেন যে, তাঁর চোখ লাল হয়ে যেত, কণ্ঠ উচ্চ হতো এবং ক্রোধ বেড়ে যেত। যেন কোনো সেনাপতি সৈন্যদের সাবধান করছে। তিনি বলতেন :

بعثت أنا والساعة كهاتين يفرق بين السبابة والوسطى، ويقول أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي مُحَمَّد، وإن شر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة»

“আমি ও কিয়ামত এ দু’টি আঙুলের মতো কাছাকাছি প্রেরিত হয়েছি।” এরপর তিনি শাহাদাত ও মধ্যমা আঙুল একসাথে মিলিয়ে ধরতেন।[২৯]

আরো বলতেন :

فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي مُحَمَّد، وإن شر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة»

“সর্বোত্তম কথা আল্লাহর কিতাব, সর্বোত্তম হিদায়াত মুহাম্মদের হিদায়াত, আর সবচেয়ে নিকৃষ্ট বিষয় হলো নতুন উদ্ভাবন; প্রত্যেক বিদ‘আতই হলো ভ্রষ্টতা।”

অন্য হাদীসে এসেছে : إياكم ومحدثات الأمور، فإن شر الأمور محدثاتها، وإن كل محدثة بدعة، وإن كل بدعة ضلالة »

“তোমরা নতুন উদ্ভাবিত বিষয় থেকে বেঁচে থাকো, কারণ এগুলোই সবচেয়ে খারাপ কাজ। আর প্রত্যেক নতুন উদ্ভাবন হলো বিদ‘আত, আর প্রত্যেক বিদ‘আত হলো ভ্রষ্টতা।”[৩০]

হযরত আয়িশা রাযিয়াল্লাহু আনহা বর্ণনা করেছেন : রাসূল ﷺ বলেছেন,

«من أحدث في أمرنا هذا ما ليس فيه فهو رد»

“যে আমাদের এই দ্বীনে এমন কিছু উদ্ভাবন করবে, যা এর অন্তর্ভুক্ত নয়, তা প্রত্যাখ্যাত হবে।”[৩১]

তিনি সঠিক পথও বুঝিয়ে দিয়েছেন। জাবির ইবনে আব্দুল্লাহ রাযিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন : “আমরা রাসূল ﷺ-এর কাছে বসেছিলাম। তিনি সামনে একটি সোজা দাগ টেনে বললেন : এটাই আল্লাহর পথ। এরপর তিনি ডানে দুটি দাগ এবং বামে দুটি দাগ টেনে বললেন : ‘এগুলো শয়তানের পথ। এরপর তিনি তাঁর হাত মধ্যবর্তী দাগে রাখলেন এবং এই আয়াত তিলাওয়াত করলেন :

﴿وَأَنَّ هَٰذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ﴾

বিদ‘আত হলো সুন্নাহ মুছে যাওয়ার ও দূরীভূত হওয়ার কারণ। মানুষ যখন বিদ‘আত চালু করে, তখন তারা সুন্নাহকে ধ্বংস করে। এজন্যই ইবনে আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেছেন :

:- « ما أتى على الناس عام إلا أحدثوا فيه بدعة وأماتوا فيه سنة، حتى تحيا البدع وتموت السنن»

“মানুষের ওপর এমন কোনো বছর (সময়) আসেনি, যাতে তারা কোনো বিদ‘আত সৃষ্টি করেনি এবং কোনো সুন্নাহকে মেরে ফেলেনি– যতক্ষণ না বিদ‘আত জীবিত হয় এবং সুন্নাহ মৃত হয়।[৩২]

---

29 صحيح مسلم، كتاب الجمعة, باب تخفيف الصلاة والخطبة(رقم:٨٦٧)(٥٩٢/٢).

30 رواه أبو داود ١٧/١ رقم: ٦٠٧) والترمذي (٤٤/٥ رقم:٢٦٧٦)

31 أخرجه البخاري: كتاب الصلح ،باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود (برقم: ٢٥٥٠)(٢/ ٩٥٩) ،ومسلم: كتاب الأقضية، باب نقض الأحكام الباطلة، ورد محدثات الأمور(برقم: ١٧١٨). (٣/ ١٣٤٣).

32 (المعجم الكبير: ١٠(/ ٢٦٢ برقم: ١٠٦١٠)

তাক্বওয়াই মু'মিনের উভয় জগতের উত্তম পাথেয়

শাইখ মো: সাইফুল ইসলাম মাদানী❖

তাক্বওয়ার মর্যাদা :

তাক্বওয়ার অনেক গুরুত্ব বা মর্যাদা রয়েছে, সর্বদায় নবীগণ তাদের উম্মতদেরকে তাক্বওয়া অবলম্বনের মাধ্যমে জীবন-যাপন করার উপদেশ প্রদান করতেন। শুধু নাবীগণ নন, সমস্ত সালফে সালিহিন ব্যক্তিবর্গ তাদের পরিবার ও বন্ধু-বান্ধবদেরকে তাক্বওয়ার রঙে রঙিন হয়ে জীবন-যাপনের আদেশ করতেন।

তাক্বওয়ার মর্যাদা সম্পর্কে কুরআনে অনেক আয়াত ও রাসূল ﷺ-এর মুখনিঃসৃত অনেক মূল্যবান বাণী রয়েছে যা আমি এক এক করে আপনাদের সামনে উপস্থাপন করবো ইনশাআল্লাহ

ইরবাজ বিন সাবিয়া রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন : কোনো একদিন রাসূল ﷺ আমাদের সালাত পড়ালেন। অতঃপর তিনি আমাদের দিকে মুখ ফিরিয়ে বসলেন এবং তিনি হৃদয়গ্রাহী একটি উপদেশ প্রদান করলেন। যার ফলে আমাদের চোখ দিয়ে অশ্রু প্রবাহিত হতে লাগলো এবং হৃদয় কেঁপে উঠলো। আমরা বললাম, হে আল্লাহর রাসূল ﷺ! মনে হচ্ছে এটি যেন বিদায়ের উপদেশ। তাই আমাদের কিছু উপদেশ দিন তিনি বলেন আমি তোমাদের আল্লাহ ভীতির উপদেশ দিচ্ছি। আর কথা শোনা ও আনুগত্য করার উপদেশ দিচ্ছি যদিও তোমাদের ওপর একজন কৃতদাসকে আমীর নির্বাচন করা হয়। তোমাদের মধ্যে যে আমার পরে বেঁচে থাকবে, সে অনেক মতভেদ দেখতে পাবে। তখন তোমরা আমার সুন্নাহকে এবং আমার পরবর্তী সৎ পথপ্রাপ্ত খুলাফায়ে রাশেদীনের সুন্নাহ দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরবে এবং তা শক্তভাবে ধারণ করবে। আর দ্বীনের মধ্যে নতুন উদ্ভাবিত বিষয় থেকে সতর্ক থাকবে; কেননা প্রত্যেক নতুন উদ্ভাবন বিদ'আত, আর প্রত্যেক বিদ'আত পথভ্রষ্টতা। উপরোক্ত হাদীসে অসংখ্য আকর্ষণীয় ও হৃদয়স্পর্শী উপদেশ রয়েছে। তার মধ্যে অন্যতম হলো তাক্বওয়াকে জীবনের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত লালন করে তার রঙে রঙিন হয়ে দুনিয়াবী সফর শেষ করে আখেরাতে রবের সাথে সাক্ষাৎ করার পথ ও পন্থার কথা বলা হয়েছে। তাক্বওয়া হলো মুমিন জীবনের মূলধন বা পুঁজি। মূলধন হারিয়ে গেলে ব্যবসায়ী যেমন নিঃস্ব হয়ে যায়, তেমনি মু'মিন তার মূলধন তাক্বওয়া হারিয়ে ফেললে সেও তার জীবন ব্যবসায় নিঃস্ব হয়ে যায়। ফলে সমস্ত শয়তানি অপশক্তির কবলে পড়ে তার ঈমানী শক্তির নিঃস্বতা আরো প্রকট আকার ধারণ করে।

তাক্বওয়ার প্রতি রাসূলগণের উপদেশ :

সমস্ত রাসূল তাদের উম্মতদেরকে তাক্বওয়া অবলম্বনের উপদেশ প্রদান করেছেন।

নূহ আলাইহিস সালাম তার জাতিকে লক্ষ্য করে বলেন :

﴿إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ نُوحٌ أَلَا تَتَّقُونَ﴾

যখন তাদের ভাই নূহ তাদেরকে বলেছিল তোমরা কি তাক্বওয়া অবলম্বন করবে না?[৩৩]

উক্ত আয়াতের মূল প্রতিপাদ্য বিষয় হলো নূহ আলাইহিস সালাম তাঁর জাতিকে এই বলে উপদেশ দিয়েছেন, ও আমার জাতি নিজেদের জীবনকে নিয়ে একটু চিন্তা করো তো, আর দেখো আল্লাহ তোমাদের জীবনকে তাঁর অসংখ্য নিয়ামত দিয়ে আনন্দ-উল্লাস ও খুশিতে ভরপুর করে দিয়েছেন। অথচ তোমরা তাঁকে ভুলে গিয়ে তারই নিয়ামত খেয়েপরে, শির্ক নামক নিকৃষ্ট পাপাচারে লিপ্ত হয়ে, অবাধ্যতার চাদর গায়ে জড়িয়ে, আত্মম্ভরিতার রোগে আক্রান্ত হয়ে আল্লাহ প্রেরিত নাবী রাসূলগণের আহ্বানে সাড়া না দিয়ে জাহান্নামের পথের যাত্রী হতে চলেছ। তারপরও কি তোমরা আল্লাহকে ভয় করবে না?

তিনি আরো বলেন -

❖ সচিব, বাংলাদেশ আহলে হাদীস মাদরাসা শিক্ষা বোর্ড।

[৩৩] সূরা শুআরা আয়াত : ১০৬।

হে আমার জাতি! আল্লাহর রাসূলগণের আহ্বানে সাড়া দাও। দেব-দেবীকে ছুঁড়ে ফেলে দাও তাদের ওপর ভয়কে অসাড় মনে করো। আল্লাহর ভয়কে নিজেদের অন্তরে জায়গা দাও এবং আল্লাহ ভীতির আলোকে জীবনকে আলোকিত করো, দেখবে কুফুরির কালো অন্ধকার তোমাদের জীবন আকাশ থেকে দূর হয়ে তাওহীদি সূর্যের আভায় জীবন আলোকিত হয়ে উঠবে।

হুদ আলায়হিস সালাম তার জাতিকে আল্লাহভীতি অর্জনের আহ্বান জানান। আল্লাহ তা'আলা কুরআনে বলেন :

﴿إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ هُودٌ أَلَا تَتَّقُونَ﴾

যখন তাদের ভাই হুদ আলায়হিস সালাম তাদেরকে বলেছিলেন : তোমরাকি তাক্বওয়া অবলম্বন করবে না?[৩৪] এই আয়াত দ্বারা হূদ আলায়হিস সালাম ঐ কথার প্রতি ইঙ্গিত করেন যে, হে আমার জাতি, তোমরা তো জানো আমি আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রেরিত একজন নাবী। কেন তোমরা স্বহস্তে নির্মিত অসাড় দেব-দেবী পূজায় মত্ত হচ্ছ, আর তোমাদের প্রকৃত সৃষ্টিকর্তাকে ভুলে গিয়ে তার অবাধ্যতায় লিপ্ত হয়ে নিজেদেরকে সৃষ্টি জীবের জঘন্যতম প্রাণীতে রূপান্তর করছো। তাহলে তোমরা কি তাঁকে ভয় করবে না? হে আমার জাতী! তাক্বওয়া নামক গুণে গুণান্বীত হও, তার প্রচার প্রসার ঘটাও দেখবে অজ্ঞতার অন্ধকার দূর হয়ে জ্ঞানের আলোয় অন্তর উদ্ভাসিত হয়ে উঠবে এবং প্রকৃত তাক্বওয়ার ফলাফল পেতে শুরু করবে, আল্লাহর ভয় রাসূলগণের অনুসরণই হলো তাক্বওয়া অর্জনের মৌলিক চিহ্ন। এ কথা যে মনে প্রাণে বিশ্বাস করে সেই তাক্বওয়াকে ধারণ করে।[৩৫]

সালেহ আলায়হিস সালাম তাঁর জাতিকে তাক্বওয়া অর্জন করার প্রতি উৎসাহ প্রদান করেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন :

﴿إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ صَالِحٌ أَلَا تَتَّقُونَ﴾

যখন তাদের ভাই সালিহ তাদেরকে বলেছিলেন, তোমরা কি তাক্বওয়া অবলম্বন করবে না?[৩৬]

লুত আলায়হিস সালাম তার জাতিকে তাক্বওয়ার প্রতি উদ্বুদ্ধ করেছেন, যখন তাদের ভাই লুত আলায়হিস সালাম বলেছিল, তোমরা কি তাক্বওয়া অবলম্বন করবে না?

উপরোক্ত আয়াতদ্বয়ে তাক্বওয়াকেই উপদেশের মধ্যমনি হিসেবে নির্ধারণ করা হয়েছে। কেননা কেবলমাত্র তাক্বওয়াই পারে মানুষের চিরশত্রু অভিশপ্ত ইবলিসের কবল থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে, শির্ক বিদ'আত ও কুসংস্কারপূর্ণ জীবন-যাপনকে বিদায় জানিয়ে মনের অন্ধকারকে তাক্বওয়ার আলোকে আলোকিত করে, ইহলৌকিক জীবনের পাপপঙ্কিলতা থেকে মুক্ত হয়ে পরলৌকিক জীবনে রবের কাছ থেকে মহাপুরুস্কার গ্রহণ করতে।

সেজন্যই সকল নাবী-রাসূল তাক্বওয়া অর্জনের জন্য তাদের উম্মাতদেরকে বহুবার আদেশ ও উপদেশ দিয়েছেন। আমরা যদি রবের একনিষ্ঠ বান্দা হতে চাই মন থেকে শয়তানী ওয়াসওয়াসা দূর করে তার ষড়যন্ত্রকে রূখে দিয়ে তাঁকেই হয়রানিতে ফেলে দিতে চাই, তাহলে তাক্বওয়া নামক অস্ত্র বা সঙ্গীকে সর্বদায় আমাদের সাথে রাখতে হবে, যাতে শয়তান নামক পাপাচারী আমাদের তাওহীদি জমিনে ঘৃণ্য শির্কী বীজ-বপন করতে না পারে।

সালাফগণ একে অপরকে তাক্বওয়ার উপদেশ দিতেন:

আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু যখন খুতবা দিতেন, তখন আল্লাহর যথাযথ প্রশংসা করার পর বলতেন, আমি তোমাদেরকে তাক্বওয়া অবলম্বনের অসিয়াত করছি।[৩৭]

আলী রাযিয়াল্লাহু আনহু যখন কোনো সামরিক দল প্রেরণ করতেন, তখন তার নেতৃত্ব একজন ব্যক্তির হাতে অর্পণ করতেন এবং তাকে বলতেন : আমি তোমাকে আল্লাহভীতির উপদেশ দিচ্ছি সেই আল্লাহর যার সঙ্গে তোমার অবশ্যই সাক্ষাত হবে।[৩৮]

আবু ওবাইদ কাসেম বিন সাল্লাম বলেন : আমি হাম্মাদ বিন যায়েদ- এর কাছে হাদীস শুনতে বসরায়

[৩৪] সূরা শু'আরা আয়াত : ১২৪।
[৩৫] সূরা শু'আরা আয়াত : ১২৪।
[৩৬] সূরা শু'আরা আয়াত : ১৪২।
[৩৭] ইমাম হাকেম হাদীসটি বর্ণনা করেন : ৩৪৪৭।
[৩৮] আসসুন্নাহ লিল খাল্লাল ৫৯ সনদ সহীহ।

গেলাম। সেখানে পৌঁছে জানতে পারলাম যে, তিনি ইতোমধ্যেই ইন্তিকাল করেছেন। তখন আমি এ বিষয়ে আব্দুর রহমান বিন মাহদীর কাছে দুঃখ প্রকাশ করলাম। তিনি বলেন : তুমি জ্ঞান বা অন্য যে কোনো বিষয়ে মানুষের চেয়ে এগিয়ে যাও না কেন, আল্লাহ ভীতিতে যেন কেউ তোমার আগে না যেতে পারে।[৩৯]

ইমাম ইবনে তাইমিয়া রহিমাহুল্লাহ বলেন : যে ব্যক্তি জানে এবং আমল করে তার কাছে আল্লাহ এবং তার রাসূলের উপদেশ অপেক্ষা আর কোনো উপদেশ অধিক গুরুত্বপূর্ণ হতে পারে তা আমার জানা নাই। কেননা আল্লাহ তাঁর পবিত্র কুরআনে বলেন,

﴿وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ﴾

তোমাদের পূর্বে যাদেরকে কিতাব দেয়া হয়েছিল তাদেরকে এবং তোমাদেরকে উপদেশ দিয়েছি যে, তোমরা আল্লাহকে ভয় করো[৪০]

উক্ত আয়াত নির্দেশ করে, পৃথিবীর সকল মানুষকে একটি গুরুত্বপূর্ণ উপদেশ দেওয়া হয়েছে আর তা হলো তাক্বওয়া অবলম্বন করা।

রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর চিরাচরিত অভ্যাস ছিলো, যখনই কাউকে কোথাও পাঠাতেন তখন তাকে উদ্দেশ করে বলতেন, আল্লাহকে ভয় করো। যেমন, আল্লাহর রাসূল মুয়াজকে যখন ইয়ামানে পাঠান তখন তাকে উদ্দেশ করে বলেন, হে মুয়ায যেখানেই থাকো না কেন আল্লাহকে ভয় করবে।

তাহলে বুঝা যায়, আল্লাহ তাঁর বান্দা, রাসূলগণ তাদের উম্মাত ও এই উম্মাতের সালফে সালেহীনগণ তাদের পরবর্তী মুসলিম ভাই ও বোনদেরকে তাক্বওয়া সম্পর্কে যে উপদেশ দিয়েছেন তাতেই তাক্বওয়ার মর্যাদা পরিষ্কার হয়ে উঠেছে।[৪১]

[৩৯] আর-রিহলাতু ফি তালাবীল হাদীস খাতীব বাগদাদী ১৭৯ পৃ.।
[৪০] সূরা আন-নিসা আয়াত : ১৩১।
[৪১] মাজমু'আ ফাতুয়া ১০/৬৫৩-৬৫৫।

অনেক মানুষ এমন রয়েছে যারা নিজেদেরকে আল্লাহর ওয়ালী বা বন্ধু মনে করে, অথচ তাদের জীবন-যাপনের দিকে তাকালে দেখা যায় আল্লাহ ও তার রাসূলের প্রতি আনুগত্যের চিহ্নটুকু পাওয়া যায় না। তারপরেও তারা নিজেদেরকে আল্লাহর ওয়ালী বা বন্ধু মনে করে, তাহলে প্রকৃত আল্লাহর বন্ধু কারা?

মুত্তাকীনরাই আল্লাহর প্রকৃত বন্ধু : যারা তাক্বওয়া লালন করে, বাস্তবে প্রয়োগ করে ও তার নিদর্শন জীবন-যাপনে প্রকাশ করে তারাই আল্লাহর প্রকৃত বন্ধু। কিন্তু তারা নয় যারা হয়তো যাদু বলে পানির ওপর হাটে ও আকাশে উড়ে বেড়াই। আল্লাহ তা'আলা তার কুরআনে বলেন :

জেনে রাখো, নিশ্চয় আল্লাহর বন্ধুদের কোনো ভয় নেই এবং তারা দুঃখিতও হবে না। তারা হলো সেইসব মানুষ যারা ঈমান এনেছে এবং সর্বদা আল্লাহভীরুতা (তাক্বওয়া) অবলম্বন করেছে।[৪২]

উপরোক্ত আয়াতের অন্তর্নিহিত তাৎপর্য হচ্ছে ঈমান এবং আল্লাহ ভীতিই রবের বন্ধুত্ব পাওয়ার মানদণ্ড। তাই বলা যেতে পারে, ঈমান এবং আল্লাহভীতি থাকলেই আল্লাহর প্রকৃত বন্ধু হওয়া যায় অন্য কোনো বস্তু দ্বারা নয়।

উক্ত আয়াতে আল্লাহ তাঁর প্রকৃত বন্ধুদেরকে এই বলে অভয় দিয়েছেন যে, হে আমার বান্দা! তোমরা যদি আমার প্রকৃত বন্ধু হয়ে যাও তাহলে দুনিয়ার সমস্ত বিপদাপদের সামনে আমার পক্ষ থেকে নির্ভয় নামক নিয়ামতের স্বাদ গ্রহণ করতে পারবে এবং আখিরাতের মহাবিপদে ভীতিজনক পরিস্থিতিতে আমার রহমত বলে তোমার কাঙ্ক্ষিত স্থানে পৌঁছে যাবে।

* সার কথা হলো, মুত্তাকীরাই প্রকৃতপক্ষে আল্লাহর ওলী যারা ফরজ ইবাদতের পাশাপাশি নাফল ইবাদত ও বিভিন্ন আনুগত্যমূলক কাজে আন্তরিকভাবে পরিশ্রম করে থাকে।

[৪২] সূরা ইউনুস আয়াত : ৬২-৬৩।

আল্লাহর বন্ধুদের বিরুদ্ধাচারণ করার পরিণাম : আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, আল্লাহর রাসূল বলেন, আল্লাহ তা'আলা বলেন : যে ব্যক্তি আমার কোনো ওয়ালীর সঙ্গে শত্রুতা করে, আমি তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করি। আমার ধার্যকৃত ফরজ আমলের মাধ্যমেই বান্দা আমার নৈকট্য লাভ করতে পারে যা আমার নিকট অধিকপ্রিয়। আর আমার বান্দা নফল ইবাদতের মাধ্যমে ক্রমাগত আমার নৈকট্য অর্জন করতে থাকে, অবশেষে আমি তাকে ভালোবাসি।[৪৩]

যারা আল্লাহর বন্ধুত্বের মিথ্যা দাবিদার তাদের কাণ্ডজ্ঞানহীন কিছু আচরণ এখানে তুলে ধরা হলো :

শাইখ সালেহ বিন মুনাজ্জিদ উপরোক্ত হাদীস উল্লেখ করার পর তার নিচে এই বক্তব্যটি তুলে ধরেছেন।

✡ এখান থেকেই স্পষ্ট হয়ে যায় তাদের দাবির মিথ্যাচার ও প্রতারণা, যারা নিজেদেরকে আল্লাহর ওয়ালী বলে দাবি করে। বিশেষত সেই সব পথভ্রষ্ট সুফিদের যারা মাওলিদের অনুষ্ঠানে (জন্মদিনের অনুষ্ঠানে) নাচে, ঢোল বাজায়, দুলতে থাকে, পড়ে যায়, নিজেদের ওপর, আচ্ছন্নতা বা মৃগীরোগের মত অবস্থা, মহানীয় রূহ এসে উপস্থিত হয়েছে বলে দাবি করে, কিশোর ছেলে ও নারীদের সঙ্গে অবাধ মেলামেশা করে। তারা মানুষকে নিজেদের কাছে সাহায্য প্রার্থনা করতে আহ্বান করে, অথবা অন্ততপক্ষে এ ধরণের কাজকে মেনে নেয়া ও তাতে সন্তুষ্ট থাকে।

আল্লাহর প্রকৃত বন্ধু আর শয়তানের বন্ধু তার পার্থক্য নিরূপনের জন্য আল্লাহ আমাদের মানদণ্ডের ব্যবস্থা করেছেন। সেই মানদণ্ডের আলোকে আমাদের কাছে পরিষ্কার হয়ে যাবে আল্লার বন্ধুদের সীমারেখায় কে রয়েছে আর কে তার সীমারেখা থেকে বের হয়ে গেছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন :

﴿إِنْ أَوْلِيَاؤُهُ إِلَّا الْمُتَّقُونَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ﴾

শুধু মুত্তাকীগণই আল্লাহর বন্ধু; কিন্তু তাদের অধিকাংশ ইহা অবগত নয়।[৪৪]।

ইমাম সায়াদী রহিমাহুল্লাহ বলেন, প্রত্যেক মুমিন এবং আল্লাহভীতি অর্জনকারীই আল্লাহর প্রকৃত বন্ধু।

তাক্বওয়ার স্তরসমূহ :

১। যে সমস্ত কাজ করলে বান্দাকে চিরস্থায়ী জাহান্নামি হতে হয়, সেসব কাজ করা থেকে বেঁচে থাকা। আর তা হলো শির্ক এবং কুফর। তাওহীদের অনুসারী হয়ে, তাওহীদী চেতনাকে ধারণ ও লালন করে চিরস্থায়ী জাহান্নাম থেকে বেঁচে থাকার জন্য চেষ্টা করতে হবে।

আল্লাহ তা'আলা বলেন :

﴿وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى﴾

আর তাদেরকে তাকওয়ার বাক্যে সুদৃঢ় করলেন যে মু'মিন তাকওয়ার বাক্যকে সাথে রাখবে অর্থাৎ লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহর শিক্ষাকে মনে প্রাণে ধারণ করবেন, তিনি কখনও চিরস্থায়ী জাহান্নামী হবেন না। (চলবে ইনশাআল্লাহ)

নবী কারীম ﷺ যুদ্ধের প্রধান সেনাপতিকে তাকওয়াশীল হওয়ার জন্য আদেশ করতেন-

عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَمَّرَ أَمِيرًا عَلَى جَيْشٍ أَوْ سَرِيَّةٍ أَوْصَاهُ فِي خَاصَّتِهِ بِتَقْوَى اللهِ وَمَنْ مَعَهُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ خَيْرًا-

সুলায়মান ইবনে বুরায়দা রাদিয়াল্লাহু আনহু তাঁর পিতা হতে বর্ণনা করেন তার পিতা বলেন, রাসূল ﷺ যখন কোন সৈন্যদলের আমীর নির্ধারণ করতেন, তখন তাকে বিশেষভাবে আল্লাহকে ভয় করার তথা তাক্বওয়া অবলম্বন করার জন্য আদেশ দিতেন। আর সাধারণ মুসলিম যোদ্ধাদেরকে কল্যাণের উপদেশ দিতেন' (সহীহ মুসলিম, বুলুগুল মারাম হা/১২৬৮)।

[৪৩] সহীহ বুখারী হা : ৬১৩৭।

[৪৪] সূরা আনফাল আয়াত : ৩৪।

মুদ্রা ব্যবসায়-এর বিধান

মুফতী শাইখ মো: আব্দুর রউফ বিন আইয়ুব আলী মাদানী❖

পূর্ব প্রকাশের পর থেকে

দ্বিতীয়ত : সমজাতীয় মুদ্রা তথা টাকা দিয়ে টাকা বাকিতে লেনদেনের বিধান :

মাসআলাটির স্বরূপ : বাকিতে এক হাজার টাকার নোট দেওয়ার কথা বলে দুইটা পাঁচশত টাকার নোট বা দশটা একশত টাকার নোট ভাংতি করা। অথবা এক হাজার টাকা পরিমাণ পাঁচ টাকার কয়েন ক্রয় করে নগদে গ্রহণ করা এক হাজার টাকার কাগজী মুদ্রা দ্বারা যা পরে দেওয়া হবে।

মাসআলাটির বিধান : মুদ্রা টাকা, ডলার, রিয়াল এক জাতীয়, সেটা কাগজী হোক বা ধাতব হোক। আর এক জাতীয় মুদ্রা বিনিময় করার সময় নগদে হতে হবে। নবী ﷺ বলেছেন : (তোমরা স্বর্ণ দ্বারা স্বর্ণ সমান সমান ছাড়া বিক্রয় করো না, একটির ওপর অপরটিকে বেশি দিয়ো না, তোমরা রৌপ্য দ্বারা রৌপ্য সমান সমান ছাড়া বিক্রয় করো না, একটির ওপর অপরটিকে বেশি দিয়ো না এবং তোমরা বাকির সাথে নগদের বিক্রয় করো না, কেবল নগদে নগদে বিক্রয় করো।[৪৫] উপরোক্ত হাদীসে স্বর্ণ দ্বারা স্বর্ণ, রৌপ্য দ্বারা রৌপ্য বাকিতে বিনিময় করা থেকে স্পষ্টভাবে নিষেধ করা হয়েছে। আর কাজগী মুদ্রা স্বর্ণ ও রৌপ্যের স্থলাভিষিক্ত। এখান থেকে আলেমগণ বলেছেন, এক জাতীয় মুদ্রা বাকিতে বিনিময় করা যাবে না। যেহেতু টাকা এক জাতীয় মুদ্রা, সেহেতু সেটা নগদে ও হাতে হাতে বিনিময় করতে হবে। যেমন কেউ কারো থেকে এক হাজার টাকা ভাংতি নিয়ে বলল আমি দুই ঘন্টা পরে এক হাজার টাকার নোট দিয়ে যাচ্ছি তাহলে সেটা বৈধ হবে না। অথবা কেউ এক হাজার টাকার নোট দিল ভাংতির জন্য কিন্তু বিনিময়ে তাকে নয়শত টাকা প্রদান করা হল এবং বলা হল এখন একশত টাকা নেই, এই একশত টাকা পরে দিবো, তাহলে এভাবে বিনিময় বৈধ হবে না। বরং সম্পূর্ণটা নগদে হতে হবে। একই ভাবে যদি এক হাজার টাকা পাঁচ টাকার কয়েন করে এবং বলে আমি এক হাজার টাকা কাগজী মুদ্রা আগামীকাল দিবো, তাহলে তা বৈধ হবে না।

মক্কা মুকার্‌রমাস্থ আল মাজমা আল ফিকহী এ ব্যাপারে এসেছে :

لا يجوز بيع الورق النقدي بعضه ببعض أو بغيره من الأجناس النقدية الأخرى من ذهب أو فضة أو غيرهما، نسيئة مطلقًا، فلا يجوز مثلاً بيع ريال سعودي بعملة أخرى متفاضلاً نسيئة بدون تقابض.

অর্থ : কাগজী মুদ্রা স্বজাতের সাথে বা ভিন্ন জাতের মুদ্রা সাথে যেমন : স্বর্ণ, অথবা রৌপ্য অথবা অন্য কোনো মুদ্রার সাথে কোনো অবস্থায় বাকিতে লেনদেন করা বৈধ নয়। অতএব সৌদি রিয়াল অন্য কোনো মুদ্রার সাথে কম-বেশি করে বাকিতে বিক্রয় করা বৈধ নয়।[৪৬]

সৌদি আরবের লাজনাহ দায়েমার ফাতাওয়াতে এসেছে :

إذا كان التبادل بين عملتين من جنس واحد، وجب التساوي بينهما، والتقابض بالمجلس، وحرم التفاضل بينهما، وحرم تأخير القبض فيهما، أو في إحداهما شرعا،

অর্থ : যখন একজাতীয় দুটি মুদ্রার মাঝে পরস্পর লেনদেন করা হবে তখন উভয়ের মাঝ সমান সমান হওয়া আবশ্যক এবং কম-বেশি করা হারাম। আর উভয় মুদ্রা বা কোনো একটি বিলম্বে গ্রহণ করা শরীআতের দৃষ্টিতে হারাম।[৪৭]

আওফি (AAOIFI) কর্তৃক প্রণীত শরীআহ স্ট্যান্ডার্ড এর প্রথম নম্বর স্ট্যান্ডার্ড- মুদ্রা ব্যবসায় এর ২/৬/২ এর মাঝে বলা হয়েছে :

❖ উস্তাযুল ফিকহ ওয়াল হাদীস, মাদরাসা মুহাম্মাদীয়া আরাবীয়া, ঢাকা।

[৪৫] সহীহ বুখারী, কিতাবুল বুয়ূ‘, বাবু বায়ইল ফিয্‌যাতি বিল ফিয্‌যা, হা : (২১৭৭); সহীহ মুসলিম, কিতাবুল বুয়ূ‘, বাবুর রিবা, হা : (১৫৮৪)।

عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ. وَلَا تَبِيعُوا الْوَرِقَ بِالْوَرِقِ. إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ. وَلَا تُشِفُّوا بَعْضَهُ عَلَى بَعْضٍ. وَلَا تَبِيعُوا شَيْئًا غَائِبًا مِنْهُ بِنَاجِزٍ، إِلَّا يدا بيد)

[৪৬] মাজাল্লাতুল মাজমাইল ফিকহিল ইসলামী, করার নং (৬), দাওরা নং (৫), (৩/৯৫২)।

[৪৭] ফাতাওয়া আল-লাজনাহ আদ-দায়েমাহ, আল-মাজমুআহ আল-উলা, (১৩/৪৪৪)।

সূচিপত্র

لا يكفي لجواز المتاجرة بالعملات قبض أحد البدلين دون الآخر، ولا قبض جزء من أحد البدلين، فإن قبض بعض البدل صح فيما تم قبضه دون الباقي.

অর্থ : মুদ্রা ব্যবসায় বৈধ হওয়ার জন্য বিনিময়কৃত মুদ্রাদ্বয়ের এক পক্ষের মুদ্রা বাকি রেখে অপর পক্ষের মুদ্রা নগদ গ্রহণ করা যথেষ্ট নয়, একইভাবে এক পক্ষের সম্পূর্ণটা নগদ গ্রহণ ও অপর পক্ষের কিছু অংশ নগদ গ্রহণ মুদ্রা ব্যবসায় বৈধ হওয়ার জন্য যথেষ্ট নয়। তাই যদি এক পক্ষের কিছু গ্রহণ করা হয় আর কিছু বাকি থাকে তাহলে যতটুকু গ্রহণ করা হয়েছে অতটুকুতে বিনিময় বিশুদ্ধ হবে, বাকিটুকুতে বিশুদ্ধ হবে না।[৪৮]

দ্বিতীয় পয়েন্ট : ভিন্ন ভিন্ন মুদ্রা বাকিতে লেনদেনের বিধান।

মাসআলার স্বরূপ : সৌদি রিয়াল ও বাংলাদেশি টাকা বিনিময়ের সময় আজ সৌদি রিয়াল গ্রহণ করে দুদিন পর বাংলাদেশী টাকা প্রদান করা।

মাসআলাটির বিধান: সৌদি রিয়াল ও বাংলাদেশী টাকা ভিন্ন ভিন্ন জাতের তাই এই দুই মুদ্রার মাঝে বিনিময় করার সময় কম-বেশি করা বৈধ। এক রিয়াল দিয়ে ত্রিশ টাকা বিক্রয় করা বৈধ। কিন্তু নগদে বিক্রয় করতে হবে। বাকিতে বিক্রয় করা হারাম হবে; কারণ তা সুদ। রসূল ﷺ বলেছেনে : স্বর্ণ দ্বারা স্বর্ণ, রৌপ্য দ্বারা রৌপ্য, গম দ্বারা গম, যব দ্বারা যব, খেজুর দ্বারা খেজুর, লবন দ্বারা লবন, সমান সমান ভাবে একই পরিমাণে ও নগদে বিনিময় করতে হবে। তবে যদি এই প্রকার গুলো ভিন্ন ভিন্ন হয়, তাহলে যেভাবে খুশি (অর্থাৎ কম-বেশি করে) বিনিময় করো যদি তা হাতে হাতে অর্থাৎ নগদে হয়।[৪৯] অত্র হাদীসের আলোকে, স্বর্ণ দ্বারা রৌপ্য কম-বেশি করে বিক্রয় করা যাবে তবে তা নগদে হতে হবে। বাকিতে জায়েয হবে না।

[৪৮] আওফির আল মাআঈর আশ শারইয়্যাহ, আল মি'ইয়ার আশ শারঈ (১): আল মুতাজারাহ ফিল উমলাত, পৃ (৫০)।

[৪৯] সহীহ মুসলিম, বাবুছ ছরফি ওয়া বাইউয যাহাবি বিল ওয়ারিকি নাকদান, হাদীস নং (১৫৮৭)।

عن عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ. قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم (الذهب بالذهب. والفضة بالفضة. والبر بالبر. والشعير بالشعير. والتمر بالتَّمْرِ. وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ. مِثْلاً بِمِثْلٍ. سَوَاءً بِسَوَاءٍ. يَدًا بِيَدٍ. فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ، فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ، إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ).

যেহেতু কাগজী মুদ্রা স্বর্ণ ও রৌপ্যের স্থলাভিষিক্ত তাই ভিন্ন ভিন্ন কাগজী মুদ্রা বাকিতে লেনদেন করা জায়েয হবে না।

সৌদি আরবের লাজনাহ দায়েমার ফাতাওয়াতে এসেছে :

إذا كان التبادل بين عملتين ....من جنسين جاز التفاضل بينهما شرعا، سواء كان ذلك في السوق السوداء أم في غيرها، وحرم تأخير بعضهما أو إحداهما.

অর্থ : যখন ভিন্ন জাতের দুইটি মুদ্রার মাঝে বিনিময় করা হবে ইসলামী বিধানুযায়ী কম-বেশি করে বিনিময় করা যাবে সেটা খোলা বাজারে হোক বা অন্য বাজারে হোক তবে উভয়টি অথবা একটি বাকিতে হওয়া হারাম হবে।[৫০]

মক্কা মুকার্‌রমাস্থ আল মাজমা আল-ফিকহী এ করারে এসেছে :

لا يجوز بيع الورق النقدي بعضه ببعض أو بغيره من الأجناس النقدية الأخرى من ذهب أو فضة أو غيرهما، نسيئة مطلقًا، فلا يجوز مثلاً بيع ريال سعودي بعملة أخرى متفاضلاً نسيئة بدون تقابض

অর্থ : কাগজী মুদ্রা স্বজাতের সাথে বা ভিন্ন জাতের মুদ্রার সাথে যেমন : স্বর্ণ, অথবা রৌপ্য অথবা অন্য কোনো মুদ্রার সাথে কোনো অবস্থায় বাকিতে লেনদেন করা বৈধ নয়। অতএব সৌদি রিয়াল অন্য কোনো মুদ্রার সাথে কম-বেশি করে বাকিতে বিক্রয় করা বৈধ নয়।[৫১]

يجوز بيع بعضه ببعض من غير جنسه مطلقًا، إذا كان ذلك يدًا بيد، فيجوز بيع الليرة السورية أو اللبنانية بريال سعودي، ورقًا كان أو فضة، أو أقل من ذلك أو أكثر، وبيع الدولار الأمريكي بثلاث ريالات سعودية أو أقل من ذلك أو أكثر، إذا كان ذلك يدا بيد

[৫০] ফাতাওয়া আল লাজনাহ আদ দায়েমাহ, আল মাজমুআহ আল উলা, (১৩/৪৪৪-৪৪৫)।

[৫১] মাজাল্লাতুল মাজমাইল ফিকহিল ইসলামী, করার নং (৬), দাওরা নং (৫), (৩/৯৫২)।

অর্থ : ভিন্ন ভিন্ন জাতের মুদ্রা পরস্পর সমান সমান ও কম-বেশি করে বিক্রয় করা বৈধ যদি তা নগদে হয়। অতএব সিরিয়ার বা লেবাননের পাউন্ড সৌদি রিয়াল (কাগজী বা রৌপ্যের) দিয়ে কম বা বেশি করে বিক্রয় করা জায়েয এবং এক মার্কিন ডলার তিন সৌদি রিয়ালের বিনিময়ে বা আরো কম-বেশি করে বিক্রয় করা বৈধ, যদি তা নগদে হয়।

অতএব অনেক সময় হাজী সাহেবরা সৌদি আরবে গিয়ে সৌদিতে কর্মরত নিজ এলাকার কোনো ব্যক্তির কাছ থেকে রিয়াল ক্রয় এবং তার বিনিময়ে বাংলাদেশে কয়েকদিন পরে উক্ত ব্যক্তির পরিবারের কাছে টাকা প্রদান করে, এটা কোনোভাবেই বৈধ নয় বরং তা সুদ। এটাকে বৈধ করতে হলে যখন রিয়াল নিবে তখনই ফোন করে উক্ত ব্যক্তির পরিবারের কাছে তার বিনিময়ে টাকা প্রদান নিশ্চিত করবে। এখানে হাজী সাহেবদেরকে দিয়ে কেবল উদাহরণ দেওয়া হয়েছে, না হলে যারাই এভাবে লেনদেন করবে তাদের সবার লেনদেনই অবৈধ হবে। আল্লাহ অধিক ভালো জানেন।

তৃতীয় পয়েন্ট : সমজাতীয় মুদ্রার ক্ষেত্রে কাগজী মুদ্রা ও ধাতব মুদ্রা কম-বেশি করে লেনদেনের বিধান।

মাসআলাটির স্বরূপ : আমাদের দেশসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশে একই মুদ্রা কাগজের হয়ে থাকে আবার ধাতবও হয়ে থাকে। যেমন, আমাদের দেশে পাঁচ টাকার ধাতব কয়েন আছে আবার পাঁচ টাকার কাগজী নোটও আছে। এখন কেউ যদি বিশটা পাঁচ টাকার কয়েন অর্থাৎ একশত টাকা পরিমাণ কয়েন একশত দশ টাকার কাগজী মুদ্রা দিয়ে ক্রয়-বিক্রয় করতে চায়, তাহলে সেটি জায়েয হবে?

মাসআলাটির বিধান : সমজাতীয় মুদ্রার ক্ষেত্রে কাগজী মুদ্রা ও ধাতব মুদ্রা কম-বেশি করে বিক্রয় করা বৈধ নাকি অবৈধ সে বিষয়ে আলেমদের থেকে দুটি মত পাওয়া যায় :

প্রথম মত : একজাতীয় মুদ্রার কাগজী নোট ও ধাতব নোট কম-বেশি করে বিক্রয় করা বৈধ নয়। এটি একদল আলেমের মত।

এ মতের দলীল : তারা দলীল দিয়ে থাকেন যে, ধাতব মুদ্রার টাকা ও কাগজী মুদ্রার টাকা দুটো একই জাতীয় মুদ্রা[৫২]। আর হাদীসে এসেছে, এক জাতীয় মুদ্রা বিনিময় করার সময় দুটি জিনিস শর্ত : ক- নগদ লেনদেন হতে হবে, খ- সমান সমান হতে হবে, কম-বেশি হওয়া যাবে না। রসূল ﷺ বলেছেন : (স্বর্ণ দিয়ে স্বর্ণ, রৌপ্য দিয়ে রৌপ্য বিনিময় করতে সমান সমান ও হাতে হাতে...)[৫৩]। আর সৌদি আরবের কিবারুল উলামা পরিষদ, ইস্যুকারী কর্তৃপক্ষ অনুযায়ী মুদ্রার জাত গণ্য করেছেন। তাই তারা সৌদির কাগজী মুদ্রার রিয়ালকে এক জাতীয় মুদ্রা ধরেছেন।[৫৪] আর ধাতব মুদ্রা, যেমন : সৌদি হালালা বা পয়সা ও ধাতব দিরহাম এগুলো কাগজী মুদ্রার শাখা-প্রশাখা। অতএব এটাকেও সৌদির এক জাতের মুদ্রা হিসেবে ধরতে হবে যা হুকুমের ক্ষেত্রে তার মূল জাতের অনুগামী হবে।[৫৫] হাম্বালী মাযহাবের ইমাম মারদাবী বলেন, কোনো জাতের শাখা-প্রশাখা ওই জাতেরই অন্তর্ভুক্ত।[৫৬] অতএব ধাতব টাকা ও কাগজী টাকা সমান সমান করে লেনদেন করা ওয়াজীব এবং কম-বেশি করে বিনিময় করা হারাম।

দ্বিতীয় মত : একই প্রকারভুক্ত কাগজী মুদ্রা ও ধাতব মুদ্রা কম-বেশি করে লেনদেন করা বৈধ। এটা কিছু আলেমের মত। আর এটাই সৌদি আরবে স্থায়ী ফাতাওয়া কমিটির ফাতাওয়া[৫৭] এবং শাইখ ইবনে উসাইমীন[৫৮] ও শাইখ ইবনে জিবরীন[৫৯] একই ফাতাওয়া প্রদান করেছেন।

এ মতের দলীল হলো : তারা দলীল দিয়ে থাকেন যে, ধাতব মুদ্রার টাকা ও কাগজী মুদ্রার টাকা এক জাতের নয় বরং তা ভিন্ন জাতের।[৬০] আর রসূল ﷺ বলেছেন, (যখন জাত ভিন্ন ভিন্ন হবে তখন তোমরা যেভাবে খুশি বিক্রয় করো তবে তা যেন নগদে হয়।)[৬১]

---

[৫২] প্রাগুক্ত।

[৫৩] সহীহ মুসলিম, বাবুছ ছরফি ওয়া বাইউয যাহাবি বিল ওয়ারিকি নাকদান, হাদীস নং (১৫৮৭)।

[৫৪] আবহাছু হাইয়াতি কিবারিল উলামা ফিল মামলাকাতিল আরাবিয়াতিস সাউদিয়া, ১/৫৭-৫৮)।

[৫৫] Islamweb.net অনলাইন ওয়েব সাইট, ফিকহুল মুআমালাত, আছ ছরফ, শুরূতুছ ছরফ ওয়া আনওয়াউহু, ফাতাওয়া নং (৩১১১৩)।

[৫৬] আল ইনছাফ ফী মা'রিফাতির রাজিহি মিনাল খিলাফ, (১২/৩০)।

[৫৭] ফাতাওয়া আল লাজনাহ আদ দায়েমাহ, আল মাজমুআহ আল উলা, (১৩/৪৫৭)।

[৫৮] লিকাউল বাবিল মাফতুহ, লিকা নং (১৭২), পৃ. ১৮।

[৫৯] ফাতাওয়াশ শাইখ ইবনে জিবরীন, (৭/১৬), ফাতাওয়াশ শাইখ ইবনে জিবরীন, (৭/১৬)।

[৬০] লিকাউল বাবিল মাফতুহ, লিকা নং (১৭২), পৃ. ১৮।

[৬১] সহীহ মুসলিম, বাবুছ ছরফি ওয়া বাইউয যাহাবি বিল ওয়ারিকি নাকদান, হাদীস নং (১৫৮৭)।

শাইখ ইবনে বায (রহিমাহুল্লাহ) বলেছেন : সমসাময়িক আলেমগণ এ বিষয়ে মতভেদ করেছেন। তাদের কেউ কেউ, এটাতে কম-বেশি করে লেনদেন করার বৈধতা প্রদান করেছেন এবং বলেছেন, একই প্রকারের কাগজী মুদ্রা ও ধাতব মুদ্রা ভিন্ন ভিন্ন জাত হিসেবে ধর্তব্য হবে। সুতরাং কম-বেশি করাতে কোনো সমস্যা নেই; কারণ রসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) বলেছেন : যখন এই জাতগুলো ভিন্ন হবে, তখন তোমরা যেভাবে খুশি বিক্রয় করতে পারো যদি তা হাতে হাতে অর্থাৎ নগদে হয়, যেভাবে স্বর্ণের বিনিময়ে রৌপ্য কম-বেশি করে বিক্রয় করা বৈধ, সৌদি রিয়ালের বিনিময়ে আমেরিকান ডলার বিক্রয় করা বৈধ ও ইত্যাদি ভিন্ন ভিন্ন জাতের মুদ্রা যেমনভাবে কম-বেশি করে বিক্রয় বৈধ; কারণ এটা এবং ওটা ভিন্ন জাতের অর্থাৎ কাগজী মুদ্রা এক জাতের ও ধাতব মুদ্রা অন্য জাতের।

তবে অন্য আলেমগণ বলেছেন, সমান সমান করে লেনদেন করা ওয়াজিব। কারণ কাগজী মুদ্রাও রিয়াল, ধাতব মুদ্রাও রিয়াল। অতএব দশ রিয়ালের বিনিময়ে দশ রিয়ালই প্রদান করতে হবে। একশত রিয়াল ধাতব মুদ্রাকে একশত রিয়াল কাগজী মুদ্রার সাথেই ক্রয়-বিক্রয় করতে হবে।

অতএব যখন সাবধানতার সুযোগ থাকবে এবং সমান সমান ছাড়া ক্রয়-বিক্রয় না করার সুযোগ থাকবে তখন তখন সমানভাবে লেনদেন করবে। আর সাবধানতা হিসেবে এটাই সবচেয়ে ভালো হবে। যেটাতে সন্দেহ আছে সেটা ছেড়ে সন্দেহ মুক্তটা গ্রহণ করার পর্যায়ভুক্ত হবে এটা; যাতে মতভেদ থেকে বের হওয়া যায়।[৬২]

শক্তিশালী মত : এ মাসআলাতে আমার নিকট শক্তিশালী মত হলো, সমজাতীয় মুদ্রার ক্ষেত্রে কাগজী মুদ্রা ও ধাতব মুদ্রা কম-বেশি করে লেনদেন করা হারাম ও সুদ; কারণ উভয়টা একজাতীয়। একজাতীয় হওয়ার দলীল হলো, পাঁচ টাকা বলতে যেমন পাঁচ টাকার কয়েন বোঝায় একই ভাবে পাঁচ টাকার কাগজী নোটকেও বোঝায়, এজন্য যদি কেউ পাঁচ টাকার জিনিস ক্রয় করে পাঁচ টাকার কয়েন প্রদান করে অথবা পাঁচ টাকার কাগজী নোট প্রদান করে তাহলে বিক্রেতা উভয়টি গ্রহণ করতে বাধ্য। এটাই প্রমাণ করে যে, ইস্যুকারী একই দেশের কাগজী মুদ্রা ও ধাতব মুদ্রা একজাতীয়। আর একজাতীয় মুদ্রা পরস্পর বিনিময়ের সময় কম বেশি করা জায়েয নয়। রসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, স্বর্ণকে স্বর্ণের সাথে সমান সমান ছাড়া বিক্রয় করো না, কম-বেশি করে বিক্রয় করো না, রৌপ্যকে রৌপ্যের সাথে সমান সমান ছাড়া বিক্রয় করো না, কম-বেশি করে বিক্রয় করো না।[৬৩] আর কাগজী মুদ্রা স্বর্ণ ও রৌপ্যের স্থলাভিষিক্ত।

আওফি (AAOIFI) কর্তৃক প্রণীত শরীআহ স্ট্যান্ডার্ড এর প্রথম নম্বর স্ট্যান্ডার্ড- মুদ্রা ব্যবসায় এর ২/১/২ এর মাঝে বলা হয়েছে :

أن يتم التماثل في البدلين الذين هما من جنس واحد، ولو كان أحدهما عملة ورقية والآخر عملة معدنية، مثل الجنيه الورقي والجنيه المعدني للدولة نفسها.

অর্থ : একজাতীয় মুদ্রা পরস্পর বিনিময় করা হলে উভয়টি সমান পরিমাণ হতে হবে, এমনকি যদি একটি মুদ্রা কাগজী হয় এবং অপরটি ধাতব হয়, যেমন : একই দেশের কাগজী পাউন্ড এবং ধাতব পাউন্ড।[৬৪] আল্লাহ অধিক ভালো জানেন।

---

[৬২] ফাতাওয়া নূরুন আলাদ দারব, লি ইবনে বায, (১৯/১৪৯)।

حكم صرف العملة الورقية إلى نقود معدنية بزيادة

س: يقول السائل: انتشرت في هذه الأيام محلات صرف العملة الورقية إلى نقود معدنية أي الهَلَل، ولكن صاحب المحل يشترط أحد أمرين إما أن يشتري من يريد الصرف شيئًا من المحل وإما أن يصرف له العشرة بتسعة مثلاً فما الحكم في ذلك (١) (٢)؟

ج: اختلف العلماء علماء العصر في هذا منهم من أجاز المفاضلة وقال: إن العملة المعدنية غير العملة الورقية فلا بأس بالتفاضل لقوله صلى الله عليه وسلم: «فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم» (٣) إذا كان يدًا بيد كما تباع الفضة بالذهب متفاضلةً والدولار بالريال السعودي متفاضلاً وغير ذلك؛ لأن هذه غير هذه، العملة الورقية غير العملة المعدنية، وقال آخرون يجب التساوي؛ لأن هذا ريال وهذا«ريال عشرة بعشرة، ومائة بمائة فإذا تيسر الاحتياط وألاّ يبيع إلا بالتساوي يكون هذا أحوط من باب الاحتياط من باب دع ما يريبك إلى ما لا يريبك خروجًا من الخلاف.»

[৬৩] সহীহ বুখারী হা : ২১৭৭, সহীহ মুসলিম হা : ১৫৮৪।

[৬৪] আওফির আল মাআঈর আশ শারইয়্যাহ, আল মি'ইয়ার আশ শারঈ (১): আল মুতাজারাহ ফিল উমলাত, পৃ (৪৯)।

কুরআনবাদের স্বরূপ সন্ধান ও সংশয় নিরসন

শাইখ আব্দুল মুমিন বিন আব্দুল খালিক্ব *

১৩ তম পর্ব

চার. কুরআনুল কারীমের সাথে হাদীসের বৈপরীত্য সৃষ্টি করা :

হাদীস অস্বীকারকারীরা কুরআন ও সুন্নাহর ওপর যুক্তিকে প্রাধান্য দিতে গিয়ে তারা প্রতারণামূলক কর্মকৌশলের আশ্রয় নেয় এবং হাদীসের সাথে কুরআনের বৈপরীত্যের সৃষ্টি করে। যাতে করে তারা সাধারণ মুসলিমদের মাঝে সুন্নাহ বা হাদীস সম্পর্কে নেতিবাচক ধারণার জন্ম দিতে পারে। কারণ কুরআনবাদের প্রাচ্যবিদ শিক্ষাগুরুরা এ কথা নিশ্চিতভাবেই জানে যে, মুসলিমদের কাছে ইসলাম চর্চার মূলভিত্তি হলো ২টি; কুরআনুল কারীম ও নাবী ﷺ-এর সুন্নাহ বা হাদীস, আর প্রথম ভিত্তির সাথে দ্বিতীয়টিকে সাংঘর্ষিক করে তুলতে পারলে মুসলিমরা ধর্মচর্চার মাঝে আস্থাহীন ও সংশয়বাদী হয়ে যাবে এবং নিজ ধর্মের প্রতি বিদ্বেষী হয়ে উঠবে। আর এজন্যই তারা তাদের ছাত্রদের চিন্তাচেতনায় এ বিষয়টির অনুপ্রবেশ ঘটায়। এরফলে কুরআনবাদী নেতাদের কাছে কুরআনের সাথে হাদীসের বৈপরীত্য সৃষ্টি করার বিষয়টি আক্বীদা বা বিশ্বাসে পরিণত হয়। অতঃপর তারা তাদের দাওয়াতী কার্যক্রমে বিষয়টি আবশ্যক করে নেয় এবং প্রচার করতে থাকে যে, প্রচলিত সকল হাদীস কুরআনের সাথে সাংঘর্ষিক, তাই হাদীস মানা যাবে না।

কুরআনবাদীদের মিসরীয় নেতা আহমাদ সুবহি মানসুর বলেন;

هذه الأحاديث الضالة تضعنا في موقف اختبار أمام الله تعالى،فإما أن نصدق القرآن نكذبها، وإما أن نصدقها ونكذب الله والقرآنه، لا محال للتوسط.

এই ভ্রষ্ট হাদীসগুলো আমাদেরকে আল্লাহর সামনে পরীক্ষায় ফেলে দিয়েছে, কুরআনকে সত্য বলে বিশ্বাস করলে হাদীসকে অস্বীকার করতে হবে এবং হাদীসকে সত্য বলে বিশ্বাস করলে আল্লাহ এবং কুরআনকে অস্বীকার করতে হবে। এ দুটোর মাঝে তথা কুরআন ও হাদীসের মাঝে সমন্বয় করার কোনো উপায় নেই।[৬৫]

কুরআনবাদের নেতা ও লেখক ইবনে শাহুর, আবু যায়দ দামানহুরী ও জামাল বান্নারা অনুরূপ বক্তব্য দিয়েছেন।এ ছাড়াও কুরআনবাদের আরো অনেক নেতাই এমন বক্তব্য দিয়ে থাকেন। যা সম্পূর্ণ মনগড়া ও মিথ্যা বক্তব্য এবং শুধু হাদীসের ওপর নয় বরং তা কুরআনুল কারীমের ওপর চরম মিথ্যা অপবাদ। প্রকৃত পক্ষে কুরআনুল কারীম কোনোভাবেই হাদীসবিরোধী নয় এবং হাদীসও কোনোভাবেই কুরআনুল কারীমের সাথে সাংঘর্ষিক নয়। কুরআনুল কারীম ও হাদীসুন নাবাবী কোনোক্রমেই বৈপরিত্যপূর্ণ নয়। যেমন; অংকের সূত্র কখনোই অংকের সাথে বৈপরীত্যপূর্ণ নয়, কম্পিউটারের আবিষ্কারের সূত্র কম্পিউটারের বিভিন্ন প্রোগ্রাম ও ফাংশনের সাথে বৈপরীত্যপূর্ণ নয় এবং আধুনিক যুগে আবিষ্কৃত বাহন কিংবা তার যন্ত্রাংশ এগুলোর আবিষ্কারের সূত্রের সাথে বৈপরীত্যপূর্ণ নয়। ঠিক তেমনই কুরআন এবং সুন্নাহ বা হাদীস কখনোই বৈপরীত্যপূর্ণ নয়। কুরআন মানবজাতির সঠিক পথের দিকনির্দেশক এবং হাদীস উক্ত পথেরই বিশ্লেষক ও রাহবার। এই লেখনীর সুন্নাহ পরিচিতি পর্বে কুরআন ও সুন্নাহ বৈপরীত্যপূর্ণ নয় বরং পরিপূরক শিরোনামে দলীল ভিত্তিক বিস্তারিত আলোকপাত করা হয়েছে।

পাঁচ . বিজ্ঞানের সাথে হাদীসের বৈপরিত্য সৃষ্টি করা :

কুরআনবাদের মিসরী ও ভারতীয় নেতৃত্বস্থানীয়দের শতকরা ৯০% নেতারা পশ্চিমা শিক্ষায় শিক্ষিত, তারা কুরআন সুন্নাহ জানা কোনো আলেম ছিলেন না। তাদের মধ্যে কেউ কেউ মাদরাসা শিক্ষায় মাধ্যমিক পর্যন্ত পড়াশোনা অসমাপ্ত রেখেই পশ্চিমা শিক্ষার দিকে ঝুঁকে পড়েছে এমন দুয়েকজনের উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। দ্বীনের জ্ঞানের গভীরতা না থাকার কারণে তারা পশ্চিমা

* মুদাররিস, মাদরাসা মুহাম্মাদীয়া আরাবীয়া, যাত্রাবাড়ী, ঢাকা
ও পাঠাগার সম্পাদক- বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস, ঢাকা মহানগর।

[৬৫] আল কুরআনু ওয়া কাফা : ৫৩পৃ.।

প্রাচ্যবিদদের ছত্রছায়ায় অতি বিজ্ঞানমনা হয়ে উঠে। তারা প্রাচ্যবিদদের একান্ত ছাত্র ও আদর্শিক শিষ্য হওয়ার কারণে খুব সহজেই পশ্চিমা নাগরিকত্ব পর্যন্তও পেয়ে যায়। তাদের মধ্যে আহমাদ সুবহি মানসুর, আহমাদ আমীন, রাশাদ খলীফাদের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এরা জন্মসুত্রে মিসরী হওয়ায় আরবী ভাষার ওপর তাদের বেশ দখল থাকায় আরবীতেও হাদীস অস্বীকার সংক্রান্ত বই লিখেছে। অতিরিক্ত বিজ্ঞানমনা তাদেরকে পশ্চিমা ও বিজ্ঞানের দাসে পরিণত করেছে। এর ফলে তারা সুন্নাহ বা হাদীসে নাবাবীকে বিজ্ঞানের কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়েছে। যেমন; সহীহ আল বুখারীর বর্ণনায় রয়েছে, নাবী ﷺ আবু যার রাযিয়াল্লাহু আনহু কে লক্ষ্য করে বললেন;

حِينَ غَرَبَتِ الشَّمْسُ : «أَتَدْرِي أَيْنَ تَذْهَبُ؟» ، قُلْتُ : اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَ : " فَإِنَّهَا تَذْهَبُ حَتَّى تَسْجُدَ تَحْتَ العَرْشِ، فَتَسْتَأْذِنَ فَيُؤْذَنُ لَهَا وَيُوشِكُ أَنْ تَسْجُدَ، فَلاَ يُقْبَلَ مِنْهَا، وَتَسْتَأْذِنَ فَلاَ يُؤْذَنَ لَهَا يُقَالُ لَهَا : ارْجِعِي مِنْ حَيْثُ جِئْتِ، فَتَطْلُعُ مِنْ مَغْرِبِهَا.

যখন সূর্য ডুবে যায় তুমি কি জান সূর্য কোথায় যায়? আবু যার রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, আমি বললাম; আল্লাহ এবং তার রাসূল ﷺ সর্বধিক জ্ঞাত। অতঃপর তিনি বললেন; যখন সূর্য ডুবে যায় তখন সে আরশের নীচে সাজদা করে এবং পুনরায় উদিত হওয়ার জন্য অনুমতি চায় এবং তাকে পূর্বদিক থেকে উদিত হওয়ার অনুমতি দেওয়া হয়। অচিরেই এমন দিন আসবে যে, সূর্য সাজদা করবে এবং উদিত হওয়ার অনুমতি প্রার্থনা করবে, কিন্তু তাকে অনুমতি দেওয়া হবে না। তাকে বলা হবে, যেখান হতে এসেছো সেখানেই ফিরে যাও। অতঃপর সূর্য পশ্চিম দিক হতে উদিত হবে।[৬৬]

কুরআনবাদের দাবি হলো এই হাদীসটি বিজ্ঞান পরিপন্থি বিধায় এটা বানোয়াট ও মিথ্যা। এ ছাড়াও কবরের আযাব, পুনরুত্থান, হাশর, হিসাব-নিকাশ ও জাহান্নাম সংক্রান্ত যতো হাদীস রয়েছে এগুলো তাদের মতে বিজ্ঞান বিরুদ্ধ তাই এগুলো মিথ্যা ও বানোয়াট!!

এখন আমার একটা বড় প্রশ্ন হলো বিজ্ঞান কি আদৌ হাদীস যাচাইয়ের ক্ষমতা রাখে? এর উত্তরে বলবো; বিজ্ঞান কোনোভাবেই সুন্নাহ বা হাদীস যাচাইয়ের সক্ষমতা রাখে না। কারণ বিজ্ঞানের প্রতিষ্ঠিত সত্য বিষয়গুলো কোনোভাবেই হাদীসের সাথে সাংঘর্ষিক নয় বরং তা আল্লাহর দেওয়া প্রযুক্তিগত নেয়ামত। আর বিজ্ঞানের যে বিষয়গুলো ধারণাপ্রসূত ও কাল্পনিক সেগুলো তো নিজের প্রতিই আস্থাশীল নয়, কাজেই সেগুলো হাদীসের মতো অকাট্য সত্য বিষয়গুলোর যাচাইয়ের সক্ষমতা তো দূরের কথা বরং নিজকে যাচাই করার ক্ষমতাও রাখে না। যেমন;

(ক). বিজ্ঞান বলছে যে, সূর্য পৃথিবী থেকে ১৩ লক্ষ গুণ বড়। যেহেতু সূর্য পৃথিবী থেকে তের লক্ষ গুণ বড় বিধায় সূর্যের পৃথিবী প্রদক্ষিণ করে আলো দেয় না বরং পৃথিবী সূর্যকে প্রদক্ষিণ করে আলো গ্রহণ করে। বিজ্ঞানের এ দাবিকে সামনে এনে কুরআনবাদিরা উল্লেখিত হাদীসকে যাচাই করে এবং অস্বীকারও করে।

বিজ্ঞানের এ দাবি কাল্পনিক ও ধারণাপ্রসূত। কারণ সূর্য পৃথিবী থেকে এতো এতো গুণ বড়, এটা পরিমাপ করেছে কে? কখন পরিমাপ করেছে? কিভাবে করেছে? কোন যন্ত্রের সাহায্যে পরিমাপ করেছে? এতে কত সময় লেগেছে? এ দাবির পেছনে প্রমাণ কী? কেন এ দাবি করা হলো তার উদ্দেশ্য বা কী? এতসব প্রশ্নের কোনো উত্তর নেই। তাহলে এরকম একটা কাল্পনিক ও ধারণাপ্রসূত তথ্যকে হাদীসের যাচাইয়ের জন্য ব্যবহার করা চরম মূর্খতা ছাড়া আর কিছু কি হতে পারে?

(খ) বিজ্ঞানের দাবি হলো এই মহাবিশ্ব বিগব্যাঙ বা মহা বিস্ফোরণের মাধ্যমে সৃষ্টি হয়েছে এবং বিজ্ঞান এ দাবিও করেছে যে, এ মহাবিস্ফোরণ সংঘটিত হতে ১০ মিলিয়ন বছর সময় লেগেছে। বিজ্ঞানের এ থিউরিটা সম্পূর্ণ কাল্পনিক ধারণা। কারণ এ বিস্ফোরণ কে দেখেছে? কার সামনে এটা সংঘটিত হয়েছে? এ দাবির পক্ষে প্রমাণ কী? ১০ মিলিয়ন বছর একটা বিস্ফোরণের সময় লাগে কিভাবে? ১০ মিলিয়ন বছর এ থিউরির প্রবক্তা কি জীবিত ছিলেন? না থাকলে তিনি এ দাবি করলেন কিসের ভিত্তিতে? এতসব প্রশ্নের কোনো উত্তর নেই। বিস্ফোরণে কোনো কিছুর সৃষ্টি হয় না বরং ধ্বংস

[৬৬] সহীহ বুখারী হা : ৩১৯৯।

হয়। তাহলে এরকম আজব ধারণা কি হাদীসের মতো চিরন্তন সত্যের যাচাই করার ক্ষমতা রাখে? আর এ বিগব্যাঙ থিউরি নামক অদ্ভুত ধারণা বাতিল হলে কি বিশ্বের অস্তিত্বই বাতিল হয়ে যাবে? কখনোই না।

(গ) বিজ্ঞান এখন পর্যন্ত মানবাত্মা সম্পর্কে অন্ধকারে আছে। আত্মার দৈর্ঘ প্রস্থ, আকার আকৃতি এবং ওজন কিংবা পরিমাণ কোনো কিছুই প্রমাণ করতে পারেনি। তাই বলে কি মানবদেহে কোনো আত্মা নেই? অবশ্যই আত্মার উপস্থিতি আছে এটাই বাস্তব এবং অনস্বীকার্য, আর বিজ্ঞান এখানে অসহায় ও অপারগ। সুতরাং বিজ্ঞান দিয়ে কুরআন-হাদীস যাচাই করা সুস্থ মানুষের কাজ নয়, এটা পাগলের কাজ।

(ঙ) বিজ্ঞান এখনো জিন জাতির অস্তিত্ব প্রমাণ করতে পারেনি এবং ফেরেশতাদের অস্তিত্বও প্রমাণ করতে পারেনি। তাহলে জিন ও ফেরেশতা বলতে কিছু নেই? এছাড়া আরো অনেক বিষয় আছে যেগুলো বিজ্ঞান প্রমাণ করা তো দূরের কথা প্রমাণের ধারেকাছেও যেতে পারেনি। এমনকি যে মহা-আকাশ নিয়ে বিজ্ঞানের এতো মাতামাতি সে মহা-আকাশ সম্পর্কেই বিজ্ঞান অন্ধকারে রয়েছে। যেমন; তারকারাজির সংখ্যা, তারকার পারস্পারিক দূরত্ব, তারকারাজির কক্ষপথ ও গতি, পৃথিবী থেকে তারকারাজির দূরত্ব, চন্দ্র ও সূর্যের দূরত্ব, তাদের কক্ষপথের দূরত্বসহ আরো অনেক বিষয়ে বিজ্ঞান শুধু অনুমানের মধ্যেই রয়েছে, চূড়ান্তভাবে কোনো কিছুই প্রমাণ করতে পারেনি। আর ধারণা কখনোই অকাট্যকে যাচাই করতে পারে না। সুতরাং হাদীস যাচাইয়ের কোনো ক্ষমতা ও অধিকার বিজ্ঞানের নেই। কুরআন ও হাদীস বিজ্ঞানের সত্যতা যাচাই করার ক্ষমতা সংরক্ষণ করে এবং তা কিয়ামত পর্যন্ত চলমান থাকবে ইনশা আল্লাহ।

৬. কুরআনুল কারীমের মনগড়া ব্যাখ্যা করা :

কুরআনবাদীদের আরো একটি মৌলিক চিন্তাধারা হলো কুরআনুল কারীমের মনগড়া ব্যাখ্যা করা ও সকল তাফসীরের কিতাব অস্বীকার করা। তাদের দাবি হলো তাফসীরে ইবনে আব্বাস, তাফসীরে ইবনে কাসীরসহ সকল তাফসীরের কিতাব পরিত্যাজ্য। কোনো তাফসীরের কিতাব বর্তমান যামানার জন্য গ্রহনযোগ্য নয়। তাদের দাবি, বিবেক দিয়ে কুরআনের তাফসীর করতে হবে। আমার প্রশ্ন হলো যুগশ্রেষ্ঠ উলামার তাফসীর যদি তাদের কাছে গ্রহণযোগ্য না হয়, তাহলে কুরআনবাদী নেতারা তো কুরআন হাদীসে অজ্ঞ, এমনকি তাদের অনেকেই এমন রয়েছে যে, বাংলা উচ্চারণ ব্যতীত কুরআনুল কারীমই পড়তে জানে না। তাহলে তাদের তো বিবেকই নেই কিভাবে তারা কুরআনের ব্যাখ্যা করবে? ব্যাখ্যা করতে যে জ্ঞান প্রয়োজন সে জ্ঞানই তো তাদের নেই। সুতরাং জ্ঞানহীন ব্যক্তির মনগড়া ব্যাখ্যা শয়তানের কুমন্ত্রণা ছাড়া তো আর কিছু হওয়ার সম্ভাবনা নেই। তাদের মূর্খতার নমুনা দেখুন;

আল্লাহ তা'আলার কথা ;

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ.﴾

হে ঈমানদারগণ তোমরা আল্লাহ ও তার রাসূলের আনুগত্য করো এবং তোমাদের মধ্য হতে উলিল আমরদের অনুসরণ করো।[৬৭]

পাকিস্তানী কুরআনবাদী নেতা গোলাম আহমাদ পারভেজ এ আয়াতে কারীমার ব্যাখ্যা করেছেন যে, উল্লেখিত আয়াতে আল্লাহ ও তার রাসূলের আনুগত্য বলতে শাসকদের আনুগত্য করার কথা বলা হয়েছে, কাজেই শাসকদের আনুগত্য করা ফরয। আবার কুরআনে বর্ণিত জান্নাত ও জাহান্নামের আয়াতগুলোর ব্যাখ্যায় পারভেজ বলেন; কুরআনে বর্ণিত জান্নাত ও জাহান্নাম বলতে নির্দিষ্ট কোনো স্থান কিংবা জায়গা বুঝায় না বরং জান্নাত ও জাহান্নাম বলতে মানুষের কর্মকৌশল বুঝানো হয়েছে!![৬৮]

ভারত উপমহাদেশের একজন কেন্দ্রীয় কুরআনবাদী নেতার তাফসীরের অবস্থা দেখুন। পারভেজ পাকিস্তানের কায়েদে আজম জিন্নাহর ধর্মীয়ও উপদেষ্টা ছিলেন বিধায় শাসকের চামচামিকেই তিনি কুরআনের তাফসীর বানিয়ে দিলেন!!।

[৬৭] সূরা আন-নিসা আয়াত : ৫৯।
[৬৮] মাজমুউ ফবতাওয়া বিন বায ৩/২৬৭-২৭১পৃ.।

ভরত পাকিস্তান মিসর ও হিজাজের ১ হাজারেরও বেশি আলেম তাকে কাফের ও মুরতাদ ঘোষণা করেছেন।[৬৯]

মিসরীয় কুরআনবাদী নেতা রাশাদ খলিফার তাফসীর দেখুন;

﴿لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ - فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ.﴾

তোমাদের মধ্য থেকেই তোমাদের কাছে একজন রাসুল এসেছেন, তোমাদেরকে যা কিছু কষ্ট দেয় তার কাছেও তা অনেক কষ্টকর। তিনি তোমাদের কল্যাণকামী ও মু'মিনদের প্রতি করুণাশীল ও দয়ালু। এরপরও যদি তারা বিমুখ থাকে, তবে তাদেরকে বলে দাও যে, আল্লাহ তা'আলাই আমার জন্য যথেষ্ট। তিনি ব্যতীত কোনো সত্য মা'বুদ নেই। আমি তাঁর ওপরই ভরসা করি এবং তিনিই মহান আরশের অধিপতি।[৭০]

কুরআনবাদী রাশাদ খলিফার দাবি হলো, এদু'টি আয়াত আল্লাহ তা'আলা নাযিল করেননি বরং শয়তান নাযিল করেছে!!

সূরা মুদ্দাস্সিরের ২৯ নং আয়াত (عَلَيْهَا تِسْعَةَ عَشَرَ) "তার ওপর নিয়োজিত রয়েছেন ১৯ জন।" এ আয়াতের ব্যাখা করতে যেয়ে রাশাদ খলীফা নিজকে নাবী বলে দাবি করে বসলেন।[৭১]

কুরআনবাদের আরো একজন মুফাস্সির ও মিসরী কুরআনবাদের আধ্যাত্মিক গুরু আহমাদ সুবহি মানসুর সূরা আল আহযাবের ৫৬ নং আয়াতের ব্যাখ্যা করতে যেয়ে বললেন; সালাতের তাশাহ্হুদে দুরূদে ইবরাহীম পাঠ করা শিরক!! আবার তিনি সূরা আল বাকারার ১৯৪-১৯৬ আয়াতের হজ্ব সংক্রান্ত তাফসীর করতে যেয়ে বললেন; হজ্বের জন্য শুধু জিলহজ্ব মাসকে নির্দিষ্ট করা যাবে না বরং যিলক্বদ জিলহজ্ব মুহার্‌রাম ও রজব মাসের যে কোনো একটি মাসের যেকোনো দিন হজ্ব পালন করলেই চলবে! এই হলো কুরআনবাদী আন্তর্জাতিক নেতাদের তাফসীরের নমুনা। এরকম আরো অনেক হাস্যকর মনগড়া কুরআনবাদী তাফসীরকারক রয়েছে। এতসব চিন্তাধারার মূলে তাদের লক্ষ্য একটাই, তা হলো দ্বীনকে ধ্বংস করে দেওয়া।

৭. দ্বীনকে ধ্বংস করাই তাদের মূল লক্ষ :

মূলত কুরআনবাদের এতো চিন্তাধারা ও বিশ্বাসের মূলে তাদের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হলো দ্বীনকে ধ্বংস করে দেওয়া এবং পশ্চিমা এজেন্ডা বাস্তবায়ন করা। আর সে কারণে তাদের সমস্ত চিন্তা-ফিকির ইসলামের দ্বিতীয় স্তম্ভ হাদীসকে কেন্দ্র করে। তাদের সকল চিন্তাধারা ও গবেষণা হাদীস অস্বীকার করার ওপরই স্বীমাবদ্ধ। কারণ শরীয়ত থেকে হাদীসকে বাদ দিতে পারলেই ইসলাম থেকে পদ্ধতিগত সকল এবাদত এমনিতেই বাতিল হয়ে যাবে এবং এর ফলে ইসলামের মৌলিক কোনো নীতিমালা থাকবে না। সুতরাং সুন্নাহ বা হাদীস অস্বীকার করার দাবি ইসলাম ধ্বংসের দাবি, আর এতে কোনো ধরনের সংশয় প্রকাশ করাও কুফরি এবং এদের ব্যাপারে যুগে যুগে হক্বপন্থি আলেমগণ মুসলিম উম্মাহকে সতর্ক করেছেন।

ইবনুল বাত্তা (রহমাতুল্লাহি 'আলাইহি) বলেন;

وَلْيَعْلَمِ الْمُؤْمِنُونَ مِنْ أَهْلِ الْعَقْلِ وَالْعِلْمِ أَنَّ قَوْمًا يُرِيدُونَ إِبْطَالَ الشَّرِيعَةِ وَدُرُوسَ آثَارِ الْعِلْمِ وَالسُّنَّةِ، فَهُمْ يُمَوِّهُونَ عَلَى مَنْ قَلَّ عِلْمُهُ وَضَعُفَ قَلْبُهُ بِأَنَّهُمْ يَدْعُونَ إِلَى كِتَابِ اللَّهِ وَيَعْمَلُونَ بِهِ، وَهُمْ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ يَهْرُبُونَ وَعَنْهُ يُدْبِرُونَ، وَلَهُ يُخَالِفُونَ وَذَلِكَ أَنَّهُمْ إِذَا سَمِعُوا سُنَّةً رُوِيَتْ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَوَاهَا الْأَكَابِرُ عَنِ الْأَكَابِرِ وَنَقَلَهَا أَهْلُ الْعَدَالَةِ وَالْأَمَانَةِ، وَمَنْ كَانَ مَوْضِعَ الْقُدْوَةِ وَالْأَمَانَةِ وَأَجْمَعَ أَئِمَّةُ الْمُسْلِمِينَ عَلَى صِحَّتِهَا أَوْ حَكَمَ فُقَهَاؤُهُمْ بِهَا، عَارَضُوا تِلْكَ السُّنَّةَ بِالْخِلَافِ عَلَيْهَا وَتَلَقَّوْهَا بِالرَّدِّ لَهَا، وَقَالُوا لِمَنْ رَوَاهَا عِنْدَهُمْ : تَجِدُ هَذَا فِي كِتَابِ اللَّهِ؟ وَهَلْ نَزَلَ هَذَا فِي الْقُرْآنِ؟ وَأْتُونِي بِآيَةٍ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ حَتَّى أُصَدِّقَ بِهَذَا، فَاعْلَمُوا رَحِمَكُمُ اللَّهُ أَنَّ قَائِلَ هَذِهِ الْمَقَالَةِ إِنَّمَا تَرَقَّقَ عَنْ صَبُوحٍ وَيُسْرٍ خَبِيئًا فِي إِرْبِغَاءَ يَتَحَلَّى بِحِلْيَةِ الْمُسْلِمِينَ

[৬৯] আল কুরআনিয়্যুনা ওয়া শাবুহাতুহুম হাওলাস সুন্নাহ : ৫৪পৃ.।
[৭০] সূরা আত-তাওবা আয়াত : ১২৮-১২৯।
[৭১] আল কুরআনিয়্যুনাল আরাব : ১১৭পৃ.।

وَيُضْمِرُ عَلَى طَوِيَّةِ الْمُلْحِدِينَ، يُظْهِرُ الْإِسْلَامَ بِدَعْوَاهُ وَيَجْحَدُهُ بِسِرِّهِ وَهَوَاهُ، فَسَبِيلُ الْعَاقِلِ الْعَالِمِ إِذَا سَمِعَ قَائِلَ هَذِهِ الْمَقَالَةِ أَنْ يَقُولَ لَهُ : يَا جَاهِلًا فِي الْحَقِّ، خَبِيثًا فِي الْبَاطِنِ، يَا مَنْ خُطِّئَ بِهِ طَرِيقُ الرَّشَادِ وَسَبِيلُ أَهْلِ السَّدَادِ، إِنْ كُنْتَ تُؤْمِنُ بِكِتَابِ اللَّهِ، وَأَنَّهُ مُنَزَّلٌ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، وَأَنَّ مَا أَمَرَكَ اللَّهُ بِهِ وَمَا نَهَاكَ عَنْهُ فَرْضٌ عَلَيْكَ قَبُولُهُ، فَإِنَّ اللَّهَ أَمَرَكَ بِطَاعَةِ رَسُولِهِ وَقَبُولِ سُنَّتِهِ، لِأَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ إِنَّمَا ذَكَرَ فَرَائِضَهُ وَأَوَامِرَهُ بِخِطَابِ أَجْمَلَهُ، وَكَلَامِ اخْتَصَرَهُ وَأَدْرَجَهُ، دَعَا خَلْقَهُ إِلَى فَرَائِضَ ذِكْرَ أَسْمَاءِهَا، وَأَمَرَ نَبِيَّهُ بِأَنْ يُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَعَانِيَهَا، وَيُوقِفَ الْأُمَّةَ عَلَى حُدُودِ شَرَائِعِهَا وَمَرَاتِبِهَا، فَقَالَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى : {وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ} [النحل : ٤٤] فَرَبُّنَا تَعَالَى هُوَ الْمُنْزِلُ، وَنَبِيُّنَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هُوَ الْمُبَيِّنُ.

জ্ঞানী ও বুদ্ধিমান ঈমানদারদের জানা উচিত যে, একটি গোষ্ঠী; তারা ইলম ও সুন্নাহর অধ্যয়ন এবং শরীয়তকে ধ্বংস করতে চায়। তারা স্বল্পশিক্ষিত ও দুর্বল অন্তরের মানুষদেরকে এই বলে আকৃষ্ট করে যে, নিশ্চয় তারা কুরআনের দিকে আহ্বান করে থাকে। অথচ তারা কুরআন থেকে পালিয়ে যায় ও পশ্চাদ্ধাবন করে এবং তারা কুরআনুল কারীমেরই বিরুদ্ধাচরণ করে। তারা যখন সুন্নাহ বা হাদীসের কথা শুনতে পায় যা রাসূল ﷺ থেকে বর্ণিত রয়েছে এবং উম্মাতের বড় বড় বিদ্বানগণ বড় বড় বিদ্বানগণ থেকে বর্ণনা করেছেন, নীতিবান ও বিশ্বস্ত আলেমগণ নকল করেছেন, সমুগ্র উম্মাহর নিকট যাদের দৃঢ়তা ও বিশ্বস্ততার পরিচিতি রয়েছে, সমগ্র মুসলিম উম্মাহ যে বর্ণনার বিশুদ্ধতা সম্পর্কে একমত এবং সমগ্র ফক্বীহগণ যা দ্বারা শারঈ বিধান প্রণয়ন করেছেন সেই সুন্নাহ বা হাদীস থেকে বিমুখ হয়েছে এবং প্রত্যাখান করেছে। তারা বলে যে, তাদের কাছে এ হাদীস কে বর্ণনা করেছে? এটা কি কুরআনে পেয়েছো? এটা কি কুরআনে বর্ণিত হয়েছে? এ বর্ণনার স্বপক্ষে একটা কুরআনের আয়াত নিয়ে এসো তাহলে আমরা এটা সত্য বলে বিশ্বাস করবো। হে জ্ঞানীগণ জেনে রাখুন! আল্লাহ তা'আলা আপনাদের প্রতি রহম করুন, নিশ্চয় এমন কথা যারা বলে তারা দ্বীনের জ্যোতির্ময় ও সহজ বিষয়গুলো নিয়ে সূক্ষ্ম ও গভীর ষড়যন্ত্রে লিপ্ত রয়েছে এবং তারা অন্তরে নাস্তিকদের গোপন বাসনা লালন করে। তারা প্রকাশ্য ইসলামের দাবি করে এবং গোপনে তা অস্বীকার করে ও প্রবৃত্তির দাসত্ব করে। সুতরাং প্রজ্ঞাবানদের কর্তব্য হলো, যখন তারা এমন কথকদের কথা শুনবে তখন তারা বলবে; ওহে সত্যের ব্যাপারে মূর্খতা প্রদর্শনকারী ও গোপনে অনিষ্ঠ লালনকারী, ওহে সহজ সরল পথ থেকে বিচ্যুত ব্যক্তি! তুমি যদি আল্লাহর প্রতি ঈমান এনে থাকো এবং নিশ্চয় কুরআন আল্লাহর পক্ষ হতে নাযিল করা হয়েছে এটা বিশ্বাস করে থাকো, তাহলে আল্লাহ তা'আলা যা তোমাকে আদেশ করেছেন এবং যা থেকে তোমাকে নিষেধ করেছেন তা গ্রহণ করা তোমার ওপর ফরয। আর আল্লাহ তা'আলা তোমাকে তাঁর রাসূলের আনুগত্য করা ও তার সুন্নাহর অনুসরণ করা ফরয করেছেন। কেননা আল্লাহ তা'আলা তাঁর ফরয বিধানগুলো ও বিধিনিষেধগুলো ব্যাপকভাবে সম্বোধন করে এবং সংক্ষিপ্ত কথায় উল্লেখ করেছেন। আর আল্লাহ তা'আলা তার ফরযিয়াতের নাম উল্লেখ করে তার দিকে মানুষকে আহ্বান করেছেন এবং তিনি তাঁর নাবী ﷺ কে সেগুলোর সুস্পষ্ট বর্ণনা দেওয়ার আদেশ করেছেন। আর জাতিকে তার শরীয়তের সীমার মধ্যে আবদ্ধ থাকার আদেশ করেছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন; আমরা তোমার ওপর কুরআন অবতীর্ণ করেছি মানুষকে তা সুস্পষ্টভাবে বুঝিয়ে দেওয়ার জন্য, যা তাদের ওপর অবতীর্ণ করা হয়েছে। যাতে করে তারা চিন্তা ভাবনা করে।[৭২]

সুতরাং আমাদের পালনকর্তা আল্লাহ তা'আলা কুরআন অবতীর্ণকারী এবং নাবী ﷺ তার ব্যাখ্যা প্রদানকারী।[৭৩]

সুতরাং কুরআনবাদের মূল লক্ষ্য হলো ইসলামকে সুন্নাহমুক্ত করে মুসলিম মিল্লাতকে আল্লাহর এবাদত বিমুখ করা এবং ইসলামকে ধ্বংস করা। আল্লাহ তা'আলা ইসলাম ও মুসলিম মিল্লাতকে তাদের এ গভীর ষড়যন্ত্র থেকে রক্ষা করুন। **(চলবে ইনশাআল্লাহ)**

---

[৭২] সূরা আন নাহল আয়াত : ৪৪।

[৭৩] আল ইবানাতুল কুবরা লি ইবনিল বাত্তা : ১/২২৩পৃ.।

উমার ফারুক (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-কে আল্লাহ তা'আলা যেভাবে সম্মানিত করেছেন

অধ্যাপক মোঃ আবুল খায়ের★

বিশ্বনবী তথা আমাদের প্রাণপ্রিয় নবী মোহাম্মাদ ﷺ-এর মৃত্যু পর ইসলাম ধর্ম এবং মুসলিমগণের রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব একটি বিরাট পর্বতের ন্যায় ভারী ছিলো। সেই বিরাট দায়িত্ব ইসলামের দুইটি যোগ্য সন্তান নিজ কাঁধে বহন করেছিলো। প্রথম ব্যক্তি ছিলেন আবু বকর (রাযিয়াল্লাহু আনহু) আর দ্বিতীয় জন ছিলেন উমার ইবনে খাত্তাব (রাযিয়াল্লাহু আনহু)।, আবু বকর সিদ্দীক (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর অবস্থা এই ছিল যে, একদিকে রাসূল ﷺ-এর বিচ্ছেদ যাতনায় তিনি অধীর ছিলেন, অন্যদিকে ইসলাম ও মুসলিম জাতির রক্ষণাবেক্ষণের মহান দায়িত্ব পালনের চিন্তায় তাঁর মস্তিস্ক সারাক্ষণ ভারাক্রান্ত ছিল। ফলে রাসূল ﷺ-এর ওফাতের পর মাত্র সোয়া দুই বছর জীবিত ছিলেন। অতঃপর এই বিপুল পরিমাণ কাজ ও বিরাট দায়িত্ব একা উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর উপরেই ন্যাস্ত হল। নিম্নে উমার ইবনুল খাত্তাব (রাযিয়াল্লাহু আনহু) সম্পর্কে একটু জানানোর চেষ্টা করছি মাত্র।

উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) ৫৮৩/৮৪ খ্রিষ্টাব্দে মক্কার বিখ্যাত কুরাইশ বংশে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম খাত্ত্বাব ইবনে নুফাইল এবং মাতার নাম ছিল সানতামাহ বিনতে হিশাম। তিনি ইনতেকাল করেন ৬৪৪ খ্রিষ্টাব্দে ২৩ হিজরীতে।

উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর ইসলাম গ্রহণ : বিশ্বনবী মুহাম্মাদ ﷺ-এর বিরুদ্ধে যুলুম, অত্যাচার, নির্যাতন এবং ষড়যন্ত্রের শেষ পদক্ষেপ হিসেবে কুরাইশ নেতারা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর চাচা আবু তালেবের কাছে যান। এখানে এসেও তাদের সুপ্ত ষড়যন্ত্র ব্যর্থ হলে শেষ পদক্ষেপ হিসেবে রাসূল ﷺ- কে হত্যার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। মহান আল্লাহ তা'আলার অশেষ রহমতে এ কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ করার কারণেই মক্কার দুই বিশিষ্ট কুরাইশ যুবক হামযা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এবং উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) কে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ এবং ইসলাম ধর্মের শক্তি লাভের সুযোগ সৃষ্টি হয়।

নবুওতের ৬ষ্ঠ বছরের যিলহজ্জ মাসে হামযা (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর ইসলাম ধর্ম গ্রহণের তিন দিন পরে উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) ইসলাম গ্রহণ করেন। অবশ্য রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর ইসলাম ধর্ম গ্রহণের জন্য মহান রাব্বুল আলামীনের নিকট দু'আও করেছিলেন।[৭৪]

ইমাম তিরমিযী এ ঘটনা আব্দুল্লাহ ইবনে উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণনা করে একে সহীহ বলে আখ্যায়িত করেছেন। নবী ﷺ দু'আ করেছিলেন, 'হে আল্লাহ, উমার ইবনে খাত্তাব এবং আবু জাহালের মধ্যে যে তোমার বেশি পছন্দনীয়, তার দ্বারা ইসলামের শক্তি বৃদ্ধি করো।

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা রাসূল ﷺ-এর এ দু'আ কবুল করেন এবং উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) মুসলিম হন। উল্লেখিত দু'জনের মধ্যে আল্লাহর কাছে উমার ইবনে খাত্ত্বাব (রাযিয়াল্লাহু আনহু) ছিলেন অধিক প্রিয়।[৭৫]

সম্মানীত পাঠকমণ্ডলী! মূলত উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর ইসলাম ধর্ম গ্রহণ সম্পর্কিত সকল বর্ণনার ওপর গভীরভাবে দৃষ্টি দিলে মনে হয় ইসলাম ধর্ম তাঁর মনে ধীরে ধীরে জায়গা করে নিয়েছিলো, অবশ্য এটা মহান রাব্বুল আলামীনের ইচ্ছা। যাইহোক এ সকল ব্যাপারে উল্লেখ করার পূর্বে তাঁর মন মেজাজ, ও ধ্যান-ধারণা সম্পর্কে সংক্ষিপ্তভাবে কিছু আলোকপাত করা জরুরি মনে করছি।

★ *সহকারী অধ্যাপক, বোয়ালিয়া মুক্তিযোদ্ধা কলেজ, কলারোয়া, সাতক্ষীরা ও খতীব, মুরারী কাটি জমঈয়তে আহলে হাদীস জামে মসজিদ।*

[৭৪] তারীখে উমার ইবনুল খাত্তাব (ইবনে জাওযী) পৃ: ১১।

[৭৫] তিরমিযী মালাকেরে আবু হাফস উমার ইবনে খাত্তাব ২য় খণ্ড, পৃ. ২০৯।

উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর মেজাজ ছিল রুক্ষ এবং সকলের নিকট তিনি ছিলেন একজন কঠোর স্বভাবের মানুষ। দীর্ঘকাল যাবত মুসলিমরা তাঁর হাতে নানাভাবে অত্যাচার নির্যাতন ভোগ করেন। মনে হয় তাঁর এহেন কার্যকলাপের মধ্যে বিপরীতধর্মী স্বভাবের একটা টানাপড়েন ছিলো। তাঁর মধ্যে একটি বৈশিষ্ট্য ছিলো তিনি তাঁর পিতা, পিতামহের আবিষ্কৃত রসম-রেওয়াজের প্রতি খুবই শ্রদ্ধাশীল ছিলেন, ছিলেন অত্যধিক মদ্যপায়ী, খেলা ধুলার প্রতিও তাঁর ছিল যথেষ্ট আগ্রহ। অন্যদিকে ঈমান ও আকীদার প্রতি মুসলিমদের দৃঢ়তা এবং অত্যাচার নির্যাতনের মুখেও তাদের ধৈর্য সহিষ্ণুতা তিনি বিস্ময় ও আগ্রহের দৃষ্টিতে অনুভব করতেন। একজন বিবেকবান মানুষের মতো তার মনে অব্যাহতভাবে এ সন্দেহ সংশয় জেগে উঠতো, ইসলাম যে বিষয়ে দাওয়াত দিচ্ছে সম্ভবত সেটাই উত্তম, অধিক পবিত্র ও উন্নত। এ কারণে তিনি হঠাৎ ক্ষেপে গেলেও আবার দ্রুত শান্তও হয়ে যেতেন।[৭৬]

উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর ইসলাম ধর্মগ্রহণের সকল বর্ণনার মূল কারণ হচ্ছে-

একবার উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু)- কে ঘরের বাইরে রাত কাটাতে হয়েছিল। এজন্য তিনি হারাম শরীফে গমন করে কাবা ঘরের পর্দার মধ্যে ঢুকে পড়েন। রাসূলু (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সে সময় সালাতে সূরা আল হাক্কাহ তেলাওয়াত করছিলেন। উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) অত্যন্ত আগ্রহ ভরে শুনতে লাগলেন এবং কুরআনের রচনাশৈলীতে মগ্ন ও অভিভূত হন। এবং শুনে তিনি মনে মনে বলছিলেন, আল্লাহর কসম, এ ব্যক্তি তো দেখছি কবি, কুরাইশদের কথাই ঠিক। এ সময় তিনি (রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)) তিলাওয়াত করেন নিশ্চয়ই এ কুরআন এক সম্মানীত রাসূলের বাণী। এটা কোনো কবির বাণী নয় তোমরা অল্পই বিশ্বাস করো।[৭৭]

উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এবার মনে মনে বললেন : এ ব্যক্তি তো দেখছি জ্যোতিষী। ঠিক ঐ সময় রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আবার তেলাওয়াত করলেন উক্ত সূরার ৪২, ৪৩ নং আয়াত যার অর্থ, এটা কোনো গণকের কথা নয়, তোমরা অল্পই উপদেশ গ্রহণ করো, এটি সৃষ্টিকুলের প্রতিপালকের কাছ থেকে অবতীর্ণ এভাবে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) উক্ত সূরার শেষ পর্যন্ত তেলাওয়াত করলেন।

উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, সেই সময় হতেই আমার মনে ইসলাম ধর্মের স্থান লাভ করে।

এ ঘটনা হতেই তাঁর মনে ইসলামের বীজ রোপিত হয়, কিন্তু তখনো তাঁর মনে জাহেলী আগ্রহ, ভক্তি অনুসরণ জনিত গোঁড়ামি এবং পূর্ব পুরুষদের দ্বীন ধর্মের প্রতি সম্মানবোধের আবরণ এতটা শক্তিশালী ছিলো, যা তাঁর হৃদয়ের বাস্তবতার ওপর বেশি দৃঢ় ছিলেন। তাই তিনি বাপ-দাদার দ্বীন ধর্মের প্রতি সম্মান দেখানোর জন্য মনের মধ্যে সুপ্ত অনুভূতির কোনো পরোয়া না করেই ইসলামের প্রতি শত্রুতায় সদা তৎপর ছিলেন।

সম্মানীত পাঠকমণ্ডলী! উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) যে কঠোর স্বভাবের অধিকারী ছিলেন এবং রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর প্রতি তার যে কী পরিমাণ আক্রোশ ছিলো তার একটি বাস্তব ঘটনা উল্লেখ করছি। একদিন তিনি তাঁর সবচেয়ে বড় শত্রু বিশ্বনবী রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে পৃথিবী থেকে চির দিনের জন্য বিদায় দেওয়ার জন্য তলোয়ার হাতে নিয়ে বেরিয়ে পড়েন। পথে নাঈম ইবনে আব্দুল্লাহ নাহহাম আদাবী অথবা বনী যোহরা অথবা বনী মাখযুমের কোনো এক লোকের সাথে তার দেখা হয়।[৭৮]

তাদের মধ্যে যে কোনো একজন উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর হাবভাব দেখে জিজ্ঞেস করলেন; উমার কোথায় যাচ্ছো? তিনি বললেন, মোহাম্মদকে হত্যা করতে যাচ্ছি। ***(চলবে ইনশাআল্লাহ)***

---

[৭৬] উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) সম্পর্কে এ মন্তব্য করেছেন মোহাম্মদ গাযালী, ফেকহুস সীরাহ পৃ. ৯২-৯৩।

[৭৭] সূরা আল হাক্কাহ আয়াত : ৪০, ৪১।

[৭৮] ইবনে হিশাম ১ম খণ্ড পৃ. ৩৪৪, তারীখে উমার ইবনে খাত্তাব পৃ. ১৭। মোখতাসারুল সারাই পৃ. ১০২।

কৃতজ্ঞতাবোধ : একটি মহৎ গুণ

শাইখ ড. আব্দুল্লাহ বিন খোরশেদ ❖

মহান আল্লাহ বলেন, هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ ‘উত্তম কাজের প্রতিফল উত্তম পুরস্কার ছাড়া কী হতে পারে?’[৭৯] প্রকৃত বুদ্ধিমান তো সেই ব্যক্তি যাকে দুনিয়া বর্জন করার পূর্বে সে নিজেই দুনিয়াকে বর্জন করেছে। মহান রবের সাথে সাক্ষাতের পূর্বেই তাঁর সাক্ষাতের জন্য প্রস্তুতি নিয়েছে, কবরের অধিবাসী হওয়ার পূর্বেই তার জন্য পাথেয় সংগ্রহ করেছে, অনর্থক বিষয় পরিত্যাগ করেছে এবং সকল কাজে নিজের বিবেচনাবোধকে কাজে লাগিয়েছে। যারা বেশি বেশি পরনিন্দা ও অন্যের দোষ চর্চায় ব্যস্ত থাকে, তাদের জীবন কখনো সুন্দর হয় না। বরং যারা উৎকৃষ্ট দ্বারা মন্দকে প্রতিহত করে, তাদের শত্রুরাও এক সময় অন্তরঙ্গ বন্ধুতে পরিণত হয়। যেমন মহান আল্লাহ বলেন,

﴿وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ﴾

‘ভাল কাজ এবং মন্দ কাজ সমান হতে পারে না। মন্দ প্রতিহত কর উৎকৃষ্ট দ্বারা; ফলে তোমার সাথে যার শত্রুতা আছে সে হয়ে যাবে অন্তরঙ্গ বন্ধুর মতো।’[৮০]

মানুষ স্বভাবগতভাবেই একটি সামাজিক জীব। সে কখনো বিচ্ছিন্নভাবে জীবনযাপন করতে পারে না; বরং পারস্পরিক সহযোগিতা, সম্প্রীতি ও সহমর্মিতার ভিত্তিতে সমাজবদ্ধ জীবন যাপনই তার প্রকৃত স্বভাব। মানুষ সমাজে পরস্পর বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে তোলে, একে অপরের সহচর হয়ে বসবাস করে, পরস্পরের প্রয়োজন পূরণ করে, কল্যাণকর কাজে অংশগ্রহণ করে এবং আন্তরিক উপদেশ ও পরামর্শের মাধ্যমে একে অপরের উপকার সাধন করে। এভাবেই তারা পারস্পরিক সহযোগিতা ও কল্যাণমূলক কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে একটি সুস্থ ও সুন্দর সমাজ গড়ে তোলে। যেহেতু মানুষের জীবন সমাজনির্ভর, তাই একটি সুশৃঙ্খল ও শান্তিপূর্ণ সমাজ প্রতিষ্ঠার জন্য নৈতিক মূল্যবোধ, সামাজিক রীতি-নীতি এবং উত্তম চরিত্রের উপস্থিতি অপরিহার্য। মানুষের জীবনে এমন কিছু গুণ রয়েছে, যা তাকে শুধুমাত্র আত্মিক শান্তি এনে দেয় না বরং সমাজে তার অবস্থানকে আরো সম্মানজনক করে তোলে। এর মধ্যে অন্যতম একটি গুণ হলো কৃতজ্ঞতাবোধ। কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা মানে হলো জীবনকে আরো সুন্দর এবং অর্থবহ করে তোলা।

সমাজে এমন মহৎ চরিত্রের মানুষের প্রয়োজন, যারা মানুষের কল্যাণে আত্মনিয়োগ করে, সামাজিক বন্ধনকে সুদৃঢ় করে এবং মানুষের মাঝে হৃদ্যতা, ভালোবাসা ও পারস্পরিক সৌহার্দ্য ছড়িয়ে দেয়। এসব গুণ একজন মানুষের পবিত্র ও নির্মল হৃদয়ের পরিচায়ক। এ ধরনের উন্নত নৈতিক চরিত্র কেবল তারাই ধারণ করতে সক্ষম, যাদেরকে মহান আল্লাহ কল্যাণকর ও সৎকর্মের জন্য মনোনীত করেছেন। যাদের একমাত্র লক্ষ্য থাকে মানুষের উপকার করা, তাদের মুখে হাসি ফোটানো এবং সমাজে কল্যাণ প্রতিষ্ঠা করা। তারা কোনো প্রতিদান, প্রশংসা বা কৃতজ্ঞতার প্রত্যাশা না করে একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে মানুষের সেবা করে থাকে। সৎকাজকে জীবনের আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করা, মানুষের অনুগ্রহের যথাযথ প্রতিদান দেওয়া এবং দয়া ও সদাচরণের বিনিময়ে দয়া ও সদাচারণ প্রদর্শন করা নিঃসন্দেহে এক মহান ও প্রশংসনীয় চরিত্রের পরিচায়ক। যেমন মহান আল্লাহ বলেন,

﴿وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ﴾

‘আল্লাহ তোমাকে যা দিয়েছেন তা দিয়ে তুমি আখিরাতে (স্থায়ী সুখভোগের) আবাস অনুসন্ধান কর, আর দুনিয়ায় তোমার অংশের কথা ভুলে যেও না, (মানুষের) কল্যাণ সাধন কর, যেমন আল্লাহ তোমার কল্যাণ করেছেন।’[৮১]

❖ আরবী প্রভাষক, হানাইল নো'মানিয়া কামিল মাদরাসা, জয়পুরহাট ও সহ-সভাপতি, জমঈয়ত শুব্বানে আহলে হাদীস, জয়পুরহাট জেলা।

[৭৯] সূরা আর-রাহমান আয়াত : ৬০।

[৮০] সূরা ফুসসিলাত আয়াত : ৩৪।

[৮১] সূরা কাসাস আয়াত : ৭৭।

সূচিপত্র

এ ব্যাপারে সবচেয়ে গ্রহণীয় ও বরণীয় সর্বোত্তম আদর্শের অধিকারী ব্যক্তিত্ব ছিলেন আমাদের নবী মুহাম্মাদ ﷺ। তার সমগ্র জীবনই ছিল উৎকৃষ্টতর এবং সুন্দরের পক্ষে। তিনি কাছের ও দূরের মুসলিম অথবা কাফের সকলের সাথেই উত্তম আচরণ করতেন। মানুষের প্রতি সুন্দর আচরণ করা ছিল তাঁর সম্মানিত ও বরকতময় জীবনের অবিচ্ছেদ্য অংশ।

আয়িশা সিদ্দীকা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বর্ণনা করেন, 'রাসূলুল্লাহ ﷺ সর্বদা বাড়িতে খাদীজা (রাযিয়াল্লাহু আনহা)-এর প্রসঙ্গ তুলে তার ভূয়সী প্রশংসা করতেন। এভাবেই তিনি একদিন খাদীজা (রাযিয়াল্লাহু আনহা)-এর কথা স্মরণ করে প্রশংসা করলে আমাকে ঈর্ষা পেয়ে বসল। আমি বললাম, "তিনি তো ছিলেন একজন বৃদ্ধা মহিলা মাত্র, আল্লাহ আপনাকে তার চেয়েও উত্তম স্ত্রী দান করেছেন।" এতে তাঁর অগ্রভাগের চুলগুলো রাগে কেঁপে ওঠে। এরপর তিনি বলেন, "কখনোই না; আল্লাহর শপথ! তিনি তার চেয়ে উত্তম কাউকে আমার জীবনে আর পাঠাননি। খাদীজা আমার প্রতি ঈমান এনেছিল, যখন মানুষেরা আমাকে অস্বীকার করেছিল। সে আমাকে সত্যায়ন করেছিল, যখন মানুষ আমার প্রতি মিথ্যারোপ করেছিল। যখন মানুষেরা আমাকে বঞ্চিত করেছিল, তখন সে আমাকে তার সম্পদ দিয়ে সাহায্য করেছিল। আল্লাহ তার মাধ্যমে আমাকে সন্তান দান করেছেন, যেখানে অন্য নারীদের মাধ্যমে সন্তান লাভে আমাকে বঞ্চিত করা হয়েছে।" আয়িশা সিদ্দীকা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বলেন, তাই আমি মনে মনে বললাম, আমি আর কখনই তাকে খারাপভাবে উল্লেখ করব না।'[৮২] অন্য একটি বর্ণনায় এসেছে, 'রসূলুল্লাহ ﷺ যখন বকরী যবেহ করতেন তখন বলতেন, এর গোশত খাদীজাহর বান্ধবীদের পাঠিয়ে দাও।'[৮৩]

অপর একটি হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, আয়িশা সিদ্দীকা (রাযিয়াল্লাহু আনহা)-এর নিকটে অবস্থানকালে একজন বৃদ্ধা মহিলা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকটে আগমন করলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে উদ্দেশ্য করে বললেন, আপনি কে? বৃদ্ধা বললেন, আমি মাযানিয়্যাহ গোত্রের জাযযামাহ (অলস)। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, বরং আপনি মাযানিয়্যাহ গোত্রের হাসসানাহ (রূপসী)। সেদিনের পরে আপনি কেমন ছিলেন? বৃদ্ধা বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আপনার জন্য আমার পিতা মাতা কুরবান হোক, ভালই ছিলাম। অতঃপর সেই বৃদ্ধা মহিলা চলে গেলে আমি জিজ্ঞাসা করলাম, হে আল্লাহর রাসূল! আপনি এই বৃদ্ধা মহিলাকে এভাবে অভ্যর্থনা জানালেন কারণ কী? রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, এই বৃদ্ধা খাদীজা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বেঁচে থাকা অবস্থায় একবার আমাদের নিকটে এসেছিলেন। আর নিশ্চয় আত্মীয়ের সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখা ঈমানের অংশ।[৮৪]

রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সুন্দর জীবনাদর্শ ও মানুষের দয়া-অনুগ্রহ ভুলে না যাওয়ার বড় একটি প্রমাণ হল, তিনি তাঁর সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ কাছের লোক আবূ বাকার (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর হৃদ্যতার কথা কখনোই ভুলে যাননি। যেমন আবূ হুরায়রা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত হয়েছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন,

مَا لأَحَدٍ عِنْدَنَا يَدٌ إِلاَّ وَقَدْ كَافَيْنَاهُ مَا خَلاَ أَبَا بَكْرٍ فَإِنَّ لَهُ عِنْدَنَا يَدًا يُكَافِئُهُ اللَّهُ بِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمَا نَفَعَنِى مَالُ أَحَدٍ قَطُّ مَا نَفَعَنِى مَالُ أَبِى بَكْرٍ وَلَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا خَلِيلاً لاَتَّخَذْتُ أَبَا بَكْرٍ خَلِيلاً أَلاَ وَإِنَّ صَاحِبَكُمْ خَلِيلُ اللَّهِ.

'আবূ বাকার ছাড়া আর কারো যে কোনো ধরনের দয়া আমার ওপর ছিল আমি তার প্রতিদান দিয়েছি। আমার ওপর তার যে দয়া রয়েছে, কিয়ামতের দিন আল্লাহ তা'আলা তাকে তার প্রতিদান দিবেন। আর আমাকে কারো সম্পদ ততটা উপকৃত করেনি, যতটা আবূ বাকারের সম্পদ করেছে। আমি যদি কাউকে অন্তরঙ্গভাবে গ্রহণ করতাম, তাহলে আবূ বাকারকেই একনিষ্ঠ বন্ধুরূপে গ্রহণ করতাম। অবগত হও! তোমাদের এই সাথী আল্লাহ তা'আলার অন্তরঙ্গ বন্ধু।'[৮৫] একইভাবে রাসূলুল্লাহ ﷺ আনসারদের দয়া-অনুগ্রহ ফিরিয়ে দিয়েছিলেন, যেভাবে তারা তাঁকে নিঃশর্ত সাহায্য করেছিল, আশ্রয় দিয়েছিল এবং তাঁর

[৮২] আহমাদ, হা : ২৪৯০৮; তাবারানী স্বীয় আল-আওসাত গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। আল্লামা হায়সামী স্বীয় মাজমাউয যাওয়াইদ কিতাবে উক্ত হাদীসকে হাসান বলেছেন।

[৮৩] সহীহ মুসলিম হা : ২৪৩৫।

[৮৪] মুসতাদরাক হাকিম হা : ৪০।

[৮৫] তিরমিযী হা : ৩৬৬১।

দাওয়াত ও বিজয়ের জন্য মূল্যবান ত্যাগ স্বীকার করেছিল। এছাড়া তারা যে মুহাজির ভাইদের সাথে ভ্রাতৃত্ব স্থাপন করেছিল, নিজেদের অর্থ দিয়ে তাদের পাশে দাড়িয়েছিল, সর্বোপরি নিজেদের ওপর মুহাজিরদেরকে যে প্রাধান্য দিয়েছিল তার বদলায় আনসারদের ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ ﷺ এরশাদ করেন,

لَوْلاَ الْهِجْرَةُ لَكُنْتُ امْرَأً مِنَ الأَنْصَارِ، وَلَوْ سَلَكَ النَّاسُ وَادِيًا وَشِعْبًا لَسَلَكْتُ وَادِىَ الأَنْصَارِ وَشِعْبَهَا، الأَنْصَارُ شِعَارٌ وَالنَّاسُ دِثَارٌ .

‘যদি আল্লাহর পক্ষ থেকে আমাকে হিজরত করানোর সিদ্ধান্ত গৃহীত না থাকত তাহলে আমি আনসারদের মধ্যকারই একজন থাকতাম। যদি লোকজন কোনো উপত্যকা ও গিরিপথ দিয়ে চলে তাহলে আমি আনসারদের উপত্যকা ও গিরিপথ দিয়েই চলব। আনসারগণ হল (নববী) ভিতরের পোশাক আর অন্যান্য লোক হল উপরের পোশাক।’[৮৬]

অন্য বর্ণনায় এসেছে, সমবেত সাহাবীদেরকে উদ্দেশ করে রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন,

أُوصِيكُمْ بِالأَنْصَارِ ، فَإِنَّهُمْ كَرِشِي وَعَيْبَتِي ، وَقَدْ قَضَوُا الَّذِى عَلَيْهِمْ ، وَبَقِىَ الَّذِى لَهُمْ ، فَاقْبَلُوا مِنْ مُحْسِنِهِمْ ، وَتَجَاوَزُوا عَنْ مُسِيئِهِمْ .

‘আমি আনসারগণের প্রতি বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখার জন্য তোমাদেরকে নির্দেশ দিচ্ছি; কেননা তাঁরাই আমার অতি আপনজন, তাঁরাই আমার বিশ্বস্ত লোক। তারা তাঁদের ওপর অর্পিত দায়িত্ব ও কর্তব্য পরিপূর্ণভাবে পালন করেছে। তাঁদের যা প্রাপ্য তা তাঁরা এখনো পায়নি। তাঁদের নেক লোকদের নেক আমলগুলো গ্রহণ করবে এবং তাঁদের ভুল-ত্রুটি মাফ করে দিবে।’[৮৭]

এভাবে রাসূলুল্লাহ ﷺ সাহাবীদের কৃত অনুগ্রহেরও প্রতিদান দিয়েছিলেন। তিনি ﷺ এরশাদ করেন,

لاَ تَسُبُّوا أَصْحَابِي ، فَلَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ أَنْفَقَ مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَبًا مَا بَلَغَ مُدَّ أَحَدِهِمْ وَلاَ نَصِيفَهُ .

‘তোমরা আমার সাহাবীদেরকে গালমন্দ কর না। তোমাদের কেউ যদি উহুদ পর্বত পরিমাণ সোনা আল্লাহর রাস্তায় ব্যয় কর, তবুও তাদের এক মুদ বা অর্ধ মুদ-এর সমপরিমাণ সাওয়াব হবে না।’[৮৮]

এমনকি রাসূলুল্লাহ ﷺ মুশরিকদের সদাচারণেরও উত্তম বিনিময় প্রদান করেছিলেন। এর অন্যতম একটি দৃষ্টান্ত হলো মুতইম ইবনু আদী। সে কুরাইশদের সেই লিখিত চুক্তিপত্র বাতিল করার প্রচেষ্টা করেছিল, যা তারা কাবাঘরে ঝুলিয়ে রেখেছিল বনু হাশিম ও বনু মুত্তালিবকে সামাজিক ও অর্থনৈতিকভাবে বয়কট করার জন্য; কারণ তারা নবী ﷺ-কে সমর্থন করেছিল। এছাড়া মুতইম ইবনু আদী তায়েফ থেকে ফেরার সময় নবী ﷺ-কে নিরাপত্তা প্রদান করেছিল। সে নিজে, তাঁর পরিবার ও তাঁর সন্তানরা অস্ত্র ধারণ করে বের হয়ে মাসজিদুল হারামে গিয়েছিল। এরপর সে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে সংবাদ পাঠালো, “আপনি প্রবেশ করুন।” তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ তাতে প্রবেশ করে কা‘বা ঘরে তাওয়াফ ও সালাত আদায় করে নিজ গৃহে ফিরে গেলেন। এই সমস্ত উপকারের কথা স্মরণ রেখেই নবী ﷺ বদরের বন্দিদের সম্পর্কে বলেছিলেন,

لَوْ كَانَ الْمُطْعِمُ بْنُ عَدِىٍّ حَيًّا ، ثُمَّ كَلَّمَنِى فِى هَؤُلاَءِ النَّتْنَى ، لَتَرَكْتُهُمْ لَهُ .

‘আজ মুতঈম ইবনু ‘আদী যদি বেঁচে থাকতেন আর এসব অপবিত্র লোকদের সম্পর্কে আমার নিকট সুপারিশ করতেন, তাহলে তার সম্মানে এদেরকে আমি (মুক্তিপণ ব্যতীতই) ছেড়ে দিতাম।’[৮৯]

অতএব সকল মানুষের জন্যেই সদাচারণ করা ও পরস্পরের মধ্যে দয়া-অনুগ্রহ ভুলে না যাওয়া কর্তব্য।

[৮৬] সহীহ বুখারী হা : ৪৩৩০।
[৮৭] সহীহ বুখারী হা : ৩৭৯৯।
[৮৮] সহীহ বুখারী হা : ৩৬৭৩।
[৮৯] সহীহ বুখারী হা : ৩১৩৯।

পিতামাতা, স্বামী-স্ত্রী, শিক্ষক এবং সকল শ্রেণীর মানুষের ক্ষেত্রেই পরস্পর কৃতজ্ঞতাবোধ থাকা জরুরি।

যেহেতু পিতা-মাতা নিজেরা জাগ্রত থেকে সন্তানদেরকে ঘুম পাড়ায়। তারা নিজেরা ক্ষুধার্ত থাকে যাতে সন্তানরা পরিতৃপ্ত হতে পারে। তারা নিজেরা খাবার গ্রহণ না করে সন্তানদেরকে খাওয়ায়। এসকল ক্ষেত্রে তারা সন্তানের জন্য হাসিমুখে সবকিছু মেনে নেয়। অতএব, সন্তানের জন্য পিতা-মাতার দয়া-অনুগ্রহের বিনিমিয় তাদের প্রতি ইহসান করা, সদয় হওয়া ও শ্রদ্ধা নিবেদনের মাধ্যমে ফিরিয়ে দেয়া কর্তব্য। এছাড়া তাদের প্রতি বিনয়ী হওয়া এবং তাদেরকে কষ্ট দেয় বা বিরক্ত করে এমন সমস্ত কিছু থেকে দূরে থাকা আবশ্যক।

আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا - وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا.﴾

‘তোমার রব হুকুম জারি করেছেন যে, তিনি ছাড়া অন্য কারো ইবাদাত করো না, আর পিতা-মাতার সঙ্গে সদ্ব্যবহার করো। তাদের একজন বা তাদের উভয়ে যদি তোমার জীবদ্দশায় বার্ধক্যে উপনীত হয়, তবে তাদেরকে বিরক্তি বা অবজ্ঞাসূচক কথা বলো না, আর তাদেরকে ভর্ৎসনা করো না। তাদের সাথে সম্মানজনক কথা বল। তাদের জন্য সদয়ভাবে নম্রতার বাহু প্রসারিত করে দাও আর বল, “হে আমার প্রতিপালক! তাদের প্রতি দয়া কর যেমনভাবে তারা আমাকে শৈশবে লালন পালন করেছেন”।’[৯০]

অতঃপর স্বামী-স্ত্রীর দাম্পত্য জীবন হল প্রশান্তি, আরাম-আয়েশ ও সুখ-শান্তির জীবন। যদি কখনো দাম্পত্য জীবনে এমন কিছু ঘটনা ঘটে যায় যা জীবনকে দুঃখ-কষ্টে নিমজ্জিত করে, জীবনকে দুর্বিষহ করে তোলে এবং হঠাৎ করে স্বাভাবিক জীবনকে বাধাগ্রস্থ করে, তাহলে সেই সময়ে সুখ-শান্তি ফিরিয়ে আনা ও সৌভাগ্য ধরে রাখার জন্য পরস্পরের প্রতি দয়া-অনুগ্রহ স্বীকার করা জরুরি।

প্রকৃত স্বামী সেই যে পরিশ্রম করে ও দুঃখ-কষ্ট সহ্য করে চলে যাতে সংসারে সুখ শান্তি বজায় থাকে। আর প্রকৃত স্ত্রী হল সেই, যে স্বামীর অবর্তমানে তার যাবতীয় বিষয়ের হেফাজত করে, তার সন্তানদের লালন-পালন করে, সম্পদের রক্ষণাবেক্ষণ করে এবং সর্বোপরি বাড়িতে সুখ-শান্তি ধরে রাখতে চেষ্টা করে। এভাবে যখন স্বামী-স্ত্রী প্রত্যেকেই পরস্পরের প্রতি পূর্ণ শ্রদ্ধাবোধ রেখে অনুগ্রহ ফিরিয়ে দেওয়ার মাধ্যমে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে তখন তাদেরকে সুখ-শান্তি ও সৌভাগ্য ছেয়ে ফেলে। মহান আল্লাহ এরশাদ করেন, وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ ‘আর তোমরা পরস্পরের মধ্যে অনুগ্রহ ভুলে যেয়ো না।’[৯১]

এভাবে একজন শিক্ষক তার সর্বস্তরের ছাত্রদের পাঠদান ও শিষ্টাচার শিক্ষা দেন। আর একজন শিক্ষককে কেবল ছাত্রদের উন্নতি ও অগ্রগতিই আনন্দিত করে। তাই ছাত্রদের জন্য ওস্তাযের অনুগ্রহ স্বীকার করা, তাকে সম্মান করা, তার জন্য দু‘আ করা, তাকে কষ্ট দেওয়া ও তার প্রতি খারাপ আচরণ করা থেকে সতর্ক থাকা কর্তব্য। একজন আদর্শ ছাত্রের কাছে শিক্ষকের মর্যাদা কতটা উঁচু হতে পারে তার উল্লেখযোগ্য একটি নযীর হলো, ইমাম বুখারী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি)-কে লক্ষ্য করে তাঁর বিশিষ্ট ছাত্র ইমাম মুসলিম বলেছিলেন,

دَعْنِي أُقَبِّلْ رجليكَ يَا أُسْتَاذَ الأُسْاتذة، وَسَيِّدَ المُحَدِّثِيْنَ، وَطبيبَ الحَدِيْثِ فِي عِلَلِهِ.

‘হে উস্তাযগণের উস্তাদ! মুহাদ্দিসগণের সরদার! এবং হাদীসের রোগের চিকিৎসক! আমাকে আপনার পদচুম্বন করার সুযোগ দিন।’[৯২] ইমাম আবূ আহমাদ হাকেম ওমর ইবনু মালিক থেকে বর্ণনা করেন,

[৯০] সূরা বনী ইসরাঈল, আয়াত : ২৩-২৪।

[৯১] সূরা আল-বাকারা, আয়াত : ২৩৭।

[৯২]. সিয়ারু আলামিন নুবালা, ১০ম খণ্ড, পৃ. ১০০; তারীখে বাগদাদ, ১৩ তম খণ্ড, পৃ. ১০৩।

مات محمد بْن إِسْمَاعِيل الْبُخَارِيّ ولم يُخلف بخُراسان مثل ابنِ عِيسَى فِي العلم والحفظ والزُّهْد والورع بكى حَتَّى عَمي.

'ইমাম বুখারী তাঁর মৃত্যুর পরে ইলম, হিফজ ও পরহেযগারিতার দিক দিয়ে তাঁর স্থলাভিষিক্ত হিসাবে ইমাম তিরমিযী -এর চেয়ে যোগ্য কাউকে ছেড়ে যাননি। ইমাম তিরমিযী তার মৃত্যু শোকে এতটাই কেঁদেছেন যে, কাঁদতে কাঁদতে অন্ধ হয়ে গেছেন।'[৯৩]

অতএব পরিশেষে বলা যায়, অবশ্যই লোক দেখানো ও হেয় করা মনোভাব ছাড়াই সম্মান ও শিষ্টাচারের সাথে পরস্পরের প্রতি কৃতজ্ঞ হওয়া জরুরি। যখন আমরা কারো অনুগ্রহের বদলায় কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করবো তখন তা গোপন রাখা উচিত। আর যদি কেউ আমাদের অনুগ্রহ ফিরিয়ে দেয় তাহলে তা প্রচার করবো। একটি প্রবাদ রয়েছে, 'মানুষের অনুগ্রহ পাথর খণ্ডের ওপর খোদাই করে লিখে রাখো। আর মানুষের দেওয়া কষ্ট বালুরাশির ওপর লিখে রাখ যাতে অনুগ্রহের বাতাস কষ্টকে মিটিয়ে দেয়।'

অতএব আমাদের ওপর সদাচরণের যোগ্য বা অযোগ্য সকলের প্রতি সদাচরণ বজায় রাখা জরুরি। যদি সেই ব্যক্তি প্রকৃতই সদাচরণের যোগ্য হয় তাহলে সে তার হকদার ছিল। আর যদি সে সদাচরণের যোগ্য না হয়ে থাকে তাহলে আমরা তার হকদার হব। আর আমরা কারো উপকার করে তার ফিরতি উপকার পাওয়ার আশা কখনোই করবো না। বরং আমরা মানুষের উপকার করতেই থাকবো, যা আমাদের উত্তম চরিত্রের পরিচায়ক হবে। রাসূলুল্লাহ -এরশাদ করেন,

لاَ يَشْكُرُ اللَّهَ مَنْ لاَ يَشْكُرُ النَّاسَ.

'যে ব্যক্তি মানুষের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে না সে আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞ নয়।'[৯৪] ❑❑

[redacted]

৯৪. আবূ দাঊদ হা : ৪৮১৩; সহীহ।

মহান আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করা ওয়াজিব

মহান আল্লাহ বলেছেন,

﴿فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِ﴾

"তোমরা আমাকে স্মরণ কর; আমিও তোমাদের স্মরণ করব। তোমরা আমার প্রতি কৃতজ্ঞ হও, আর কৃতঘ্ন হয়ো না।" *(সূরা বাকারা আয়াত : ১৫২)*

তিনি অন্যত্র বলেন,

﴿لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ﴾

"তোমরা কৃতজ্ঞ হলে তোমাদেরকে অবশ্যই অধিক দান করব, আর অকৃতজ্ঞ হলে অবশ্যই আমার শাস্তি হবে কঠোর।" (সূরা ইব্রাহীম আয়াত : ৭)

তিনি অন্য জায়গায় বলেন, وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ "বল, সমস্ত প্রশংসা আল্লাহরই।" (সূরা ইসরা আয়াত : ১১১)

তিনি আরও বলেছেন,

﴿وَآخِرُ دَعْوَاهُمْ أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾

"তাদের শেষ বাক্য হবে, আলহামদু লিল্লাহি রাব্বিল আলামীন (সমস্ত প্রশংসা সারা জাহানের প্রতিপালক আল্লাহর জন্য)।" *(সূরা ইউনুস আয়াত : ১০)*

আবূ হুরাইরা হতে বর্ণিত, যে রাতে নবী -কে মি'রাজ ভ্রমণে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল, সে রাতে তাঁর নিকট মদ ও দুধের দু'টি পাত্র আনা হল। তখন তিনি উভয়ের দিকে তাকিয়ে দেখে দুধের তুলে নিলেন। এ দেখে জিবরাঈল বললেন : 'সেই আল্লাহর প্রশংসা, যিনি আপনাকে প্রকৃতির দিকেই পথ দেখালেন। যদি আপনি মদের পাত্রটি ধারণ করতেন, তাহলে আপনার উম্মত পথভ্রষ্ট হয়ে যেত।'[৯৫] ❑❑

95 *মুসলিম- সহীহুল বুখারী ৩৩৯৪, ৩৪৩৭, ৫৫৭৬, ৫৬০৩, মুসলিম ১৬৮, ১৭২, তিরমিযী ৩১৩০, নাসায়ী ৫৬৫৭, আহমাদ ২৭৩০৬, ১০২৬৯, দারেমী ২০৮৮*

শুব্বানে পাতা　صفحات الشبان

সাহাবীদের মাঝে মতভিন্নতার ক্ষেত্রে পারস্পরিক শিষ্টাচার (প্রেক্ষিত : ওমর ইবনুল খাত্তাব ও খালিদ বিন ওয়ালিদ)

মূল : ড. মুহাম্মদ বিন আবদুল্লাহ আস-সাল্লামী

অনুবাদ : তানযীল আহমাদ*

মানুষের সৃষ্টি, স্বভাব ও মনস্তাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্যের মধ্যে বৈচিত্র্য,[৯৬] এমনকি তাদের ঈমানের কমবেশি হওয়া মহান সৃষ্টিকর্তার একটি ঐশ্বরিক নিয়ম ও মহিমান্বিত হিকমতের অংশ। আর এ কারণেই মানুষের মধ্যে "ব্যক্তিগত পার্থক্য" দেখা যায়, যা মানবজাতির পারস্পরিক পরিপূরকতা বা একে অপরের অভাব পূরণে ভূমিকা রাখে। এই মহাবিশ্বকে সচল ও প্রাণবন্ত রাখার পেছনে এটি আল্লাহর এক অনন্য নিদর্শন। মানুষের এই বৈচিত্র্যময় চারিত্রিক গুণাবলি এবং তাদের শক্তি ও দুর্বলতার বাস্তবতাকে সর্বোত্তম উপায়ে মূল্যায়ন করাই আসল বিষয়।

এই সঠিক মূল্যায়নের একটি উজ্জ্বল উদাহরণ হলো– আবু বকর সিদ্দিক ও ওমর ইবনুল খাত্তাব (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর খেলাফতকালে খালিদ বিন ওয়ালিদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-কে বিভিন্ন অঞ্চলের শাসনভার ও জিহাদের ময়দানে সেনাবাহিনীর নেতৃত্ব প্রদান এবং পরবর্তীতে ওমর (রাযিয়াল্লাহু আনহু) কর্তৃক খালিদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-কে পদচ্যুত করার সিদ্ধান্ত। এ পদচ্যুতি বা অপসারণের ঘটনাটি প্রথমবার হিজরি ১৩ সনে ঘটে থাকুক কিংবা দ্বিতীয়বার হিজরি ১৭ সনে কিন্নাসরিনের ঘটনাকে কেন্দ্র করে হোক; আর এটি কোনো অঞ্চলের শাসনভার থেকে হোক কিংবা সেনাবাহিনীর নেতৃত্ব থেকে হোক– খালিদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) অত্যন্ত সন্তুষ্টি ও আনুগত্যের সাথে তা মেনে নিয়েছিলেন। ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ থেকে এই ঘটনাটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, বিশেষ করে কিছু বিদ্বেষপরায়ণ ইতিহাসবিদদের কাছে। তাই এ অপসারণের পেছনের প্রকৃত কারণ ও এর সাথে জড়িত বর্ণনাগুলোর চুলচেরা বিশ্লেষণ ও পর্যালোচনা করা জরুরি। কারণ, অতীত ও বর্তমানের ইসলামবিদ্বেষী ও শত্রুরা এ ঘটনাকে কেন্দ্র করে এমন সব মনগড়া ব্যাখ্যা ও কল্পকাহিনী ছড়িয়েছে যার কোনো শক্তিশালী ভিত্তি বা সঠিক ঐতিহাসিক পদ্ধতি নেই। অথচ এ অপসারণের ভেতরে এমন অনেক মহৎ গুণ লুকিয়ে রয়েছে, যা সমস্ত সংশয় ও অপবাদকে ধূলিসাৎ করে দেয়!

এ কারণেই আমি সচেতনভাবে এ প্রবন্ধের শিরোনাম "খালিদের অপসারণ" রাখিনি। কারণ, পক্ষপাতদুষ্ট ঐতিহাসিকদের কাছে এ 'অপসারণ' শব্দটি গুণের চেয়ে ত্রুটি খোঁজার সাথেই বেশি সম্পৃক্ত। তাছাড়া এই প্রবন্ধটির মূল উদ্দেশ্য এই অপসারণের চেয়েও বড় ও গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় ফুটিয়ে তোলা; আর তা হলো– সাহাবিদের পারস্পরিক মতভিন্নতা এবং এর পেছনের শিষ্টাচার এবং কীভাবে দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনের ক্ষেত্রে এ ভিন্নতাকে পরিপূরক শক্তি হিসেবে কাজে লাগানো হয়েছিল।

সাহাবিদের মধ্যকার এ পরিপূরকতা ও মতভিন্নতার শিষ্টাচারের একটি আদর্শ উদাহরণ হিসেবে আল্লাহর সাহায্য নিয়ে বলছি : খালিদ বিন ওয়ালিদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-কে পদচ্যুত করা হয়েছিল এবং ঐতিহাসিক বিভিন্ন সূত্রে এ অপসারণের প্রকৃত কারণগুলো চমৎকারভাবে উঠে এসেছে। ইসলামে সাহাবিদের মাঝে ঘটে যাওয়া বিষয়গুলো নিয়ে মন্দ আলোচনা করতে নিষেধ করা হয়েছে; যেমনটি মহান আল্লাহ বলেন :

﴿تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُم مَّا كَسَبْتُمْ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾

"তারা এমন এক জাতি যারা অতীত হয়ে গেছে। তারা যা অর্জন করেছে তা তাদের, আর তোমরা যা অর্জন করেছ তা তোমাদের। তারা যা করত, সে সম্পর্কে তোমাদের জিজ্ঞেস করা হবে না।"[৯৭]

*** সাধারণ সম্পাদক, জমঈয়ত শুব্বানে আহলে হাদীস বাংলাদেশ ।**

[৯৬] 'খিলাফ' এবং 'ইখতিলাফ'-এর মধ্যে পারিভাষিক পার্থক্য : ইখতিলাফ হলো লক্ষ্য এক কিন্তু পথ ভিন্ন হওয়া (যা প্রমাণের ওপর ভিত্তি করে হয় এবং এটি রহমত স্বরূপ), আর খিলাফ হলো লক্ষ্য ও পথ উভয়ই ভিন্ন হওয়া (যা প্রমাণের ওপর ভিত্তি করে হয় না এবং এটি বিদ'আতের অন্তর্ভুক্ত)। (আল-কুল্লিয়াত, আবু আল-বাকা আল-কাফউই: পৃষ্ঠা ৬১)।

[৯৭] সূরা আল-বাকারা আয়াত : ১৩৪।

সূচিপত্র

খালিদ বিন ওয়ালিদের অপসারণের বিষয়টিও এর অন্তর্ভুক্ত। বিশেষ করে দুর্বল বা বানোয়াট বর্ণনার ওপর ভিত্তি করে সাহাবিদের মর্যাদা ক্ষুণ্ন হয় এমন কোনো আলোচনা করা যাবে না। বর্ণনার গ্রহণযোগ্যতা যাচাই এবং ঐতিহাসিক ঘটনা পর্যালোচনার ক্ষেত্রে এটি একটি অন্যতম মূলনীতি, যা ইসলামের শত্রুরা অতীত ও বর্তমানে সবসময়ই অজ্ঞতাবশত কিংবা ইচ্ছাকৃতভাবে এড়িয়ে গেছে।

খালিদ বিন ওয়ালিদ রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর অপসারণ সংক্রান্ত বর্ণনাগুলো একত্রিত করে ইলমী পদ্ধতিতে গবেষণা করলে আবু বকর ও ওমর রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর সুশাসনের গভীর তাৎপর্য ও প্রজ্ঞা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। এ অপসারণ প্রথমবার হোক বা দ্বিতীয়বার– এর পেছনের কারণগুলো প্রশাসনিক ও নৈতিক মূল্যের এক বিশাল দিক উন্মোচন করে।

এ অপসারণের মূলত চারটি প্রধান কারণ ছিল, যা একে অপরের সাথে সম্পর্কিত বা স্বতন্ত্র হতে পারে। বিভিন্ন বর্ণনার শব্দ ও প্রেক্ষাপট বিশ্লেষণ করে এই কারণগুলো পাওয়া যায় :

প্রথম কারণ : খালিদ বিন ওয়ালিদ রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর আকাইদ বা বিশ্বাসের সুরক্ষা নিশ্চিত করার ব্যাপারে ওমর ইবনুল খাত্তাব রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর গভীর আকাঙ্ক্ষা।

খালিদ রাযিয়াল্লাহু আনহু যেন একের পর এক বিজয়ের কারণে নিজের বীরত্ব নিয়ে অহংকারে লিপ্ত না হন বা আত্মতুষ্টিতে না ভোগেন, সেই আশঙ্কা ওমরের ছিল। বিভিন্ন বর্ণনায় ওমরের উক্তি, حتى يعلما (যাতে তারা দুজনে জানতে পারে) এবং وليس إياهما (তাদের কারণে নয়)–থেকে এ বিষয়টি অনুমিত হয়। ওমরের এ পদক্ষেপ ছিল খালিদের প্রতি তাঁর গভীর ভালোবাসা, স্নেহ ও সহানুভূতির বহিঃপ্রকাশ। খালিদ তাঁর দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করেছিলেন এবং কখনো পিছপা হননি। কিন্তু ওমরের এ সিদ্ধান্ত ছিল একটি ইজতিহাদ বা চিন্তাপ্রসূত পদক্ষেপ, যার মাধ্যমে তিনি সাধারণ ও বিশেষ সর্বস্তরের মানুষের মনে এই বিশ্বাস দৃঢ় করতে চেয়েছিলেন যে– বিজয় আসে মূলত আল্লাহর দেখানো আদর্শের মাধ্যমে, কোনো ব্যক্তির একক শক্তিতে নয়; বিজয় কোনো নির্দিষ্ট ব্যক্তির ওপর নির্ভরশীল নয়, তিনি যত বড় বীরই হোন না কেন। ওমর রাযিয়াল্লাহু আনহু তাঁকে কেবল সেনাপতিত্ব থেকে অব্যাহতি দিয়েছিলেন, সম্পূর্ণ বরখাস্ত করেননি; যা পরবর্তীতে গণিমতের মাল বণ্টনের মতপার্থক্যের আলোচনা থেকে স্পষ্ট হবে। ইবনে সাদ বর্ণনা করেন, ওমর ইবনুল খাত্তাব রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন,

لأعزلن خالد بن الوليد والمثنى، مثنى بن شيبان حتى يعلما أنَّ الله إنما كان ينصر عباده، وليس إياهما كان ينصر .

“আমি অবশ্যই খালিদ বিন ওয়ালিদ এবং মুসান্না বিন শাইবানকে অপসারণ করব, যাতে তারা দুজনে জানতে পারে যে, আল্লাহ তাঁর বান্দাদের সাহায্য করেন, তাঁদের দুজনকে নয়।”[৯৮] আরেকটি বর্ণনায় ইবনে আসাকির উল্লেখ করেন, ওমর রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেছিলেন,

أما والله! لأن صيَّر الله هذا لأمر إليَّ لأعزلن المثنى بن حارثة عن العراق وخالد بن الوليد عن الشام، حتى يعلما أنما نصر الله دينه ليس إياهما نصر .

আল্লাহর কসম! যদি এ খিলাফতের দায়িত্ব আমার কাছে আসে, তবে আমি অবশ্যই ইরাক থেকে মুসান্না বিন হারিসাকে এবং শাম (সিরিয়া) থেকে খালিদ বিন ওয়ালিদকে অপসারণ করব, যাতে তারা জানতে পারে যে আল্লাহ তাঁর দ্বীনকে সাহায্য করেন, তাঁদের দুজনকে নয়।[৯৯] ইবনে আসাকির ওমরের খেলাফতকালের আরেকটি বর্ণনা উল্লেখ করেন, যেখানে তিনি বলেন, “আমি খালিদকে অবশ্যই অপসারণ করব যাতে সে জানতে পারে যে আল্লাহ তা'আলা খালিদ ছাড়াই তাঁর দ্বীনকে বিজয়ী করতে পারেন।”[১০০] এ বর্ণনা সব খালিদের বাস্তব জীবনের প্রেক্ষাপটে অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক; কারণ জাহেলিয়াত বা ইসলাম– কোনো যুগেই তিনি কোনো যুদ্ধে পরাজিত হননি। তাঁর সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ, যুদ্ধকৌশল, পরিকল্পনা, শক্তি ও সাহসের অনন্য সংমিশ্রণ তাঁকে তৎকালীন অন্যতম প্রধান সেনাপতিতে পরিণত করেছিল। তাই উম্মাহর বৃহত্তর স্বার্থেই এ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল।

[৯৮] তাবাকাত ইবনে সাদ : ৩/৩৮৪।
[৯৯] তারিখ দিমাশ্‌ক ৫/৫৫৭, মুখতাসার তারিখ দিমাশ্‌ক ৮/২০।
[১০০] তারিখ দিমাশ্‌ক ৫/৭৭৫, সিয়ার আলাম আন-নুবালা : ৪/৩৭৮।

দ্বিতীয় কারণ : মুসলিম উম্মাহর বিশ্বাসের বিশুদ্ধতা রক্ষা করা।

ওমর রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর কাছে এটি অত্যন্ত সংবেদনশীল বিষয় ছিল। একক কোনো ব্যক্তির চেয়ে উম্মাহর আকিদার বিশুদ্ধতা অনেক বেশি মূল্যবান। ওমরের এ সিদ্ধান্তের ফলে খালিদের ব্যক্তিগত জীবনে বা মুসলিম উম্মাহর কোনো ক্ষতি হয়নি, বরং জনস্বার্থই অগ্রাধিকার পেয়েছে। ইসলামী শরিয়তের একটি বিখ্যাত নীতি হলো– درء المفاسد مقدَّم على جلب المصالح (ক্ষতি দূর করা কল্যাণ আনার চেয়ে উত্তম) এবং- ارتكاب أدنى المفسدتين لدفع أعلاهما سائغ شرعاً (বৃহত্তর ক্ষতি এড়াতে ক্ষুদ্রতর ক্ষতি মেনে নেওয়া বৈধ)। খালিদের নেতৃত্বে থাকা উম্মাহর আকিদায় কোনো ফিতনা বা বিভ্রান্তি তৈরি করতে পারে– এ আশঙ্কা থেকেই ওমর এ পদক্ষেপ নেন। বিভিন্ন সূত্রে এসেছে যে, ওমর রাযিয়াল্লাহু আনহু বিভিন্ন প্রদেশে চিঠি লিখে পাঠিয়েছিলেন–

إني لم أعزل خالداً عن سخطة أو خيانة، ولكن الناس فُتنوا به فخشيت أن يُوكَلوا إليه ويُبتلوا، فأحببت أن يعلموا أن الله هو الصانع وأن لا يكونوا بعُرُضِ [بطريق] فتنة

“আমি খালিদকে কোনো অসন্তুষ্টি বা খিয়ানতের কারণে অপসারণ করিনি। বরং মানুষ তার ওপর অতিরিক্ত নির্ভরশীল (ফিতনায় পড়ে) হয়ে উঠছিল; আমি আশঙ্কা করছিলাম যে, মানুষ আল্লাহর ওপর ভরসা ছেড়ে তার ওপর ভরসা করা শুরু করবে। তাই আমি চেয়েছি মানুষ জানুক যে, আল্লাহই সবকিছুর কর্তা এবং তারা যেন কোনো বিভ্রান্তিতে না পড়ে।”[১০১] এমনকি ইবনে কাসীরের বর্ণনায় খালিদের আমানতদারী ও সাহসিকতার প্রতি ওমরের গভীর আস্থার প্রমাণ মেলে; যখন খেলাফতের দায়িত্ব ওমরের কাছে এলো, তিনি খালিদকে অপসারণ করে আবু উবাইদাহ ইবনুল জাররাহকে দায়িত্ব দিলেন এবং তাঁকে আদেশ করলেন যেন তিনি খালিদের সাথে পরামর্শ করেন। এভাবে তিনি আবু উবাইদার আমানতদারী ও খালিদের সাহসিকতাকে একত্রিত করলেন।[১০২]

[১০১] তারিখ দিমাশক ৫/৫৬১, আল-কামিল লি ইবনিল আসির :২/৫৩৭, আল-বিদায়াহ ওয়ান-নিহায়াহ : ৭/১১, তারিখ আত-তাবারী : ৪/৬৮।
[১০২] আল-বিদায়াহ ওয়ান-নিহায়াহ : ৭/৭৬।

তৃতীয় কারণ : খালিদের কঠোরতার বিষয়টি বহুল প্রচলিত ছিল।

আবু বকরের খেলাফতকালে ওমর রাযিয়াল্লাহু আনহু আবু বকরকে বলেছিলেন, তাঁকে অপসারণ করুন, কারণ তাঁর তলোয়ারে কঠোরতা রয়েছে। তখন আবু বকর বলেছিলেন : لا أشيم [أي لا أُغمِد] سيفاً سلَّه الله على الكفار আল্লাহ কাফেরদের বিরুদ্ধে যে তলোয়ার কোষমুক্ত করেছেন, তা আমি খাপবদ্ধ করব না।”[১০৩] তাঁর এ কঠোরতার একটি উদাহরণ হলো বনু জাযিমার বন্দীদের হত্যা করা (যা ছিল তাঁর একটি ভুল ইজতিহাদ)। এর পরিপ্রেক্ষিতে রাসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম দুবার বলেছিলেন, اللَّهُمَّ إِنِّي أَبْرَأُ إِلَيْكَ مِمَّا صَنَعَ خَالِدُ بنُ الوَلِيدِ - “হে আল্লাহ! খালিদ যা করেছে তা থেকে আমি আপনার কাছে দায়মুক্তি চাচ্ছি।”[১০৪] রাসুল ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেননি যে, “আমি খালিদ থেকে মুক্ত”, বরং “তার কাজ থেকে মুক্ত” বলেছিলেন। এর অর্থ হলো, খালিদের ইজতিহাদ ভুল ছিল এবং এটি অন্যদের জন্য একটি সতর্কবার্তা ছিল। রিদ্দার যুদ্ধের সময় মালিক বিন নুওয়াইরাহকে হত্যা করাও ছিল তাঁর এমনই একটি ভুল ইজতিহাদ।[১০৫] তবে অন্য কিছু বর্ণনা খালিদের এ কঠোরতার সপক্ষে যুক্তি দেয়, কারণ কাফের ও মুরতাদদের মনে ভয় সৃষ্টি করার জন্য কখনো কখনো এ কঠোরতার প্রয়োজন ছিল। তাছাড়া মানুষ হিসেবে তিনি ভুলের উর্ধ্বে ছিলেন না। তাঁর ভুল ইজতিহাদের জন্যও তিনি সওয়াবের অধিকারী হবেন (যেহেতু নিয়ত সঠিক ছিল)। তাঁর প্রশংসনীয় কঠোরতার ব্যাপারে আল্লাহর রাসুল ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম-এর এ উক্তিই যথেষ্ট–

خالدُ بنُ الوَلِيدِ سَيفٌ مِن سُيوفِ اللهِ، سَلَّه اللهُ على الكُفَّارِ والمنافقين.

“খালিদ বিন ওয়ালিদ আল্লাহর তলোয়ারগুলোর মধ্যে একটি তলোয়ার, যা আল্লাহ কাফের ও মুনাফিকদের বিরুদ্ধে অবতীর্ণ করেছেন।”[১০৬] রাসুল ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম আরো বলেছিলেন,

[১০৩] আল-বিদায়াহ ওয়ান-নিহায়াহ : ৬/৩২২।
[১০৪] সহীহ আল-বুখারী : ৭১৮৯।
[১০৫] আল-বিদায়াহ ওয়ান-নিহায়াহ : ৬/৩২৩
[১০৬] সিয়ার আলাম আন-নুবালা : ১/৩৭২।

لا تُؤذوا خالداً، فإنَّه سيفٌ مِن سيوفِ اللهِ، صبَّه اللهُ على الكفَّارِ.

"তোমরা খালিদকে কষ্ট দিও না, কারণ সে আল্লাহর তলোয়ারগুলোর একটি, যা কাফেরদের ওপর আপতিত হয়েছে।" [১০৭]

চতুর্থ কারণ : আর্থিক লেনদেন বা সম্পদ বণ্টনের ক্ষেত্রে খালিদের নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি।

আলী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) যখন ওমর (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-কে জিজ্ঞেস করেছিলেন, আপনি কেন তাঁকে অপসারণ করলেন? তখন ওমর (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বললেন : গণ্যমান্য ও বাগ্মী ব্যক্তিদের অতিরিক্ত অর্থ দেওয়ার কারণে...[১০৮] অন্য বর্ণনায় ওমর বলেন, فوالله ما نقمت على خالدٍ في شيءٍ إلا في إعطائه المال –"আল্লাহর কসম, আমি খালিদের ওপর অন্য কোনো কারণে অসন্তুষ্ট নই, কেবল তার অতিরিক্ত অর্থ দেওয়ার কারণে।" [১০৯]

ইবনে হাজার (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) একটি বর্ণনা উল্লেখ করেছেন যা নির্দেশ করে যে, এ বিষয়টিই খালিদের দ্বিতীয়বার অপসারণের কারণ ছিল। জুবায়ের বিন বাক্কার মালেক বিন আনাস থেকে বর্ণনা করেন, "ওমর (রাযিয়াল্লাহু আনহু) আবু বকর (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-কে বলেছিলেন : খালিদকে লিখুন, যেন আপনার অনুমতি ছাড়া কাউকে কিছু না দেয়। আবু বকর তা-ই করলেন। খালিদ উত্তরে লিখলেন : হয় আমাকে আমার কাজের স্বাধীনতায় ছেড়ে দিন, অন্যথায় আপনার কাজ আপনার কাছেই রাখুন। ওমর তখন তাঁকে অপসারণের পরামর্শ দিলে আবু বকর বললেন : খালিদের মতো দায়িত্ব কে পালন করবে? ওমর বললেন : আমি করব।... পরবর্তীতে ওমর যখন খলিফা হলেন, তিনি খালিদকে লিখলেন : আমার অনুমতি ছাড়া একটি ভেড়া বা উটও কাউকে দেবে না। খালিদ আবু বকরের মতো ওমরকেও একই উত্তর দিলেন। তখন ওমর বললেন : আমি যদি আবু বকরকে যে পরামর্শ দিয়েছিলাম তা নিজে বাস্তবায়ন না করি, তবে আল্লাহর সাথে সত্যবাদী হব না। এরপর তিনি তাঁকে অপসারণ করেন।" [১১০]

এ ঘটনাটি শাসকের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে মতামত প্রকাশের ও পরামর্শের অধিকারের প্রমাণ দেয়। তাবারী হিজরি ১৭ সনের এক বর্ণনায় খালিদের অর্থ ব্যয়ের ঘটনা উল্লেখ করে বলেন যে, খালিদ এক যুদ্ধে প্রচুর ধনসম্পদ লাভ করেন এবং খালিদ আশআস বিন কায়েসকে দশ হাজার দিরহাম উপহার দেন।[১১১] নাসায়ীও খালিদের এ গুণের কথা উল্লেখ করে ওমরের একটি ভাষণ বর্ণনা করেন; যেখানে ওমর বলেন, "আমি খালিদের ব্যাপারে আপনাদের কাছে দুঃখ প্রকাশ করছি। আমি তাকে এ অর্থ দুর্বল মুহাজিরদের জন্য সংরক্ষণ করতে বলেছিলাম, কিন্তু সে তা বীর ও গণ্যমান্য ব্যক্তিদের দিয়ে দিয়েছে। তাই আমি তাকে সরিয়ে আবু উবাইদাহকে দায়িত্ব দিয়েছি... "[১১২] সম্পদ বণ্টনের ক্ষেত্রে খালিদের এ উদারতাই ছিল তাঁর অপসারণের অন্যতম কারণ।

খলিফা হিসেবে ওমর (রাযিয়াল্লাহু আনহু) মনে করতেন রাষ্ট্রের প্রতিটি ছোট-বড় খরচের ওপর কেন্দ্রের সরাসরি নিয়ন্ত্রণ থাকা উচিত। অন্যদিকে আবু বকর (রাযিয়াল্লাহু আনহু) খালিদকে এ স্বাধীনতা দিয়েছিলেন। খালিদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) মনে করতেন যুদ্ধক্ষেত্রে কৌশলগত কারণে প্রভাবশালীদের মন জয় করা ইসলামের স্বার্থেই প্রয়োজন, যেমনটি রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) হুনাইনের যুদ্ধের পর করেছিলেন। খালিদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) নিজে বলেছিলেন,

كنت في حرب ومكايدة، وكنت شاهداً وكان غائباً [يعني عمر بن الخطاب رضي الله عنه] فكنت أعطي ذلك، فخالفهُ ذلك من أمري.

"আমি যুদ্ধে ব্যস্ত ছিলাম, আর তিনি (ওমর) অনুপস্থিত ছিলেন। আমি পরিস্থিতি দেখে অর্থ দিয়েছি, কিন্তু তিনি আমার এ সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করেছেন।" [১১৩] অর্থাৎ,

---

[১০৭] সহীহ ইবনে হিব্বান : ৭০৯১, মুখতাসার তারিখ দিমাশ্‌ক : ৮/১৫।
[১০৮] তাবাকাত ইবনে সাদ : ৫/৪২-৪৩,
মুখতাসার তারিখ দিমাশ্‌ক : ৮/২৬।
[১০৯] তাবাকাত ইবনে সাদ : ৫/৪৩।
[১১০] আল-ইসাবাহ : ২/২৫৫, তারিখ দিমাশ্‌ক : ৫/৫৫৮,
সিয়ার আলাম আন-নুবালা : ১/৩৯৭।
[১১১] তারিখ আত-তাবারী : ৪/৬৭।
[১১২] আস-সুনান আল-কুবরা, কিতাবুল মানাকিব : ৫/৭৭, তারিখ দিমাশ্‌ক : ৫/৫৫৯, আত-তারিখ আল-কুবরা লিল বুখারী : ৫৪, মুসনাদে আহমাদ : ৩/৪৭৬, আল-মুজাম আল-কবীর লিত-তাবারানী : ২২/২৯৮, মাজমাউজ জাওয়ায়েদ : ৯/৩৫০।
[১১৩] আস-সুনান আল-কুবরা, কিতাবুল মানাকিব : ৫/৭৭,

যুদ্ধক্ষেত্রের প্রত্যক্ষদর্শী যা দেখেন, দূর থেকে তা অনুধাবন করা কঠিন।

এ মতভিন্নতা এমন বিষয়ে ছিল যেখানে কোনো সুস্পষ্ট ও অকাট্য শারঈ দলীল ছিল না। এটি ছিল সম্পূর্ণ প্রশাসনিক ইজতিহাদ। খালিদের এ আনুগত্য উম্মাহকে এক বড় বিভক্তি থেকে রক্ষা করেছিল। সাহাবিদের এ মতভিন্নতা তাঁদের পারস্পরিক ভালোবাসা ও ভ্রাতৃত্বকে বিন্দুমাত্র ক্ষুণ্ন করেনি।

সহজাত ও চিন্তাগত মতভিন্নতার পরিপূরকতা

এ ঘটনা থেকে একটি অত্যন্ত সুন্দর প্রশাসনিক ভারসাম্য বা নেতৃত্বের ভূমিকা পরিবর্তনের (شدة ও لين – কঠোরতা ও কোমলতা) নীতি শেখা যায়। ইবনে তাইমিয়াহ (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) এ বিষয়ে তাঁর 'সিয়াসা শারইয়াহ' গ্রন্থে চমৎকার ব্যাখ্যা দিয়েছেন। তিনি উল্লেখ করেছেন যে,

لأن المتولي الكبير، إذا كان خُلقه يميل إلى اللين، فينبغي أن يكون خُلق نائبه يميل إلى الشدة، وإذا كان خُلُقه يميل إلى الشدة، فينبغي أن يكون خلق نائبه يميل إلى اللين، ليعتدل الأمر. ولهذا كان أبو بكر الصديق رضي الله عنه يُؤْثِر استنابة خالد، وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يؤثر عزل خالد، واستنابة أبي عبيدة بن الجراح رضي الله عنه، لأن خالداً كان شديداً كعمـر بن الخطاب، وأبا عبيدة كان ليِّناً كأبي بكر، وكان الأصلح لكل منهما أن يولِّي من ولاَّه، ليكون أمره معتدلاً، ويكون بذلك من خلفاء رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي هو معتدل، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا التوازن المطلوب: (أنا نبي الرحمة، أنا نبي الملحمة). وقال: (أنا الضحوك القتَّال)،

তারিখ দিমাশ্‌ক : ৫/৫৫৯, আত-তারিখ আল-কুবরা লিল বুখারী : ৫৪, মুসনাদে আহমাদ : ৩/৪৭৬, আল-মুজাম আল-কবীর লিত-তাবারানী : ২২/২৯৮, মাজমাউজ জাওয়ায়েদ : ৯/৩৫০।

"আবু বকর (রাযিয়াল্লাহু আনহু) খালিদকে পদে বহাল রেখে সঠিক করেছিলেন এবং ওমর (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-ও তাঁর খেলাফতের সময় খালিদকে অপসারণ করে সঠিক সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। যখন একজন নেতা কঠোর হন, তখন তাঁর সহকারীর কোমল হওয়া উচিত এবং এর বিপরীতও প্রযোজ্য। আবু বকর নিজে কোমল স্বভাবের ছিলেন, তাই তিনি কঠোর স্বভাবের খালিদকে পছন্দ করতেন। অন্যদিকে ওমর নিজে কঠোর স্বভাবের ছিলেন, তাই তিনি কোমল স্বভাবের আবু উবাইদাহ ইবনুল জাররাহকে প্রধান সেনাপতি হিসেবে বেছে নেন, যাতে প্রশাসনে ভারসাম্য বজায় থাকে। নাবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, আমি রহমতের নাবী আবার আমি যুদ্ধেরও নাবী। অন্যত্র তিনি বলেন, আমি অনেক বেশি হাসি আবার শত্রু নিধনও করি।"[১১৪]

অনুরূপভাবে হাফেজ যাহাবী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি)-ও এ কঠোরতা ও কোমলতার মিশ্রণ সম্পর্কে চমৎকার মন্তব্য করেছেন। রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর উম্মতের বৈশিষ্ট্যই হলো– তারা কাফেরদের প্রতি কঠোর এবং নিজেদের প্রতি দয়ালু। রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) নিজে আবু বকরের কোমলতা এবং ওমরের কঠোরতা– উভয়কেই কাজে লাগাতেন।[১১৫]

ইসলামের এ সুমহান সুষম বণ্টন নীতির আরেকটি উদাহরণ হলো– রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আবু যর (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর সততার ভূয়সী প্রশংসা করা সত্ত্বেও তাঁকে কোনো প্রশাসনিক দায়িত্ব বা নেতৃত্ব দিতে নিষেধ করেছিলেন তাঁর কোমলতার কারণে।[১১৬] আবার কখনো পরিস্থিতি বিবেচনায় আমর বিন আস বা উসামা বিন যায়েদকে তাঁদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ সাহাবিদের ওপর নেতা বানিয়েছিলেন।[১১৭]

মুহাম্মদ আস-সাদিক আরজুন (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) তাঁর গ্রন্থে লিখেছেন যে, একটি উদীয়মান জাতির জন্য কেবল একজন ব্যক্তির মেধার ওপর নির্ভরশীল থাকা উচিত নয়, বরং অন্যান্য যোগ্য ব্যক্তিদের জন্য পথ উন্মুক্ত করা উচিত যাতে জাতির কাছে সবসময় যোগ্য নেতৃত্বের একটি বড় ব্যাকআপ বা রিজার্ভ থাকে।[১১৮] (চলবে ইনশাআল্লাহ)

[১১৪] আস-সিয়াসা আশ-শারইয়াহ, ইবনে তাইমিয়াহ : পৃষ্ঠা ৩০।
[১১৫] আল-মুন্তাকা মিন মিনহাজিল ইতিদাল : পৃষ্ঠা ৩৬২।
[১১৬] সহীহ মুসলিম হা : ১৮২৬।, সুনান আত-তিরমিযী : ৩৮০১।
[১১৭] আস-সিয়াসা আশ-শারইয়াহ : পৃষ্ঠা ১৬।
[১১৮] কিতাবু খালিদ বিন ওয়ালিদ : পৃষ্ঠা ৩১৮।

ফাতাওয়া ও মাসায়েল | الفتاوى والمسائل

ফাতাওয়া বোর্ড, বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস

☞ প্রশ্ন (১) ***সহীহ হাদীস দ্বারা জানা যায় যে, আল্লাহ রাতের তিন ভাগের এক ভাগ অবশিষ্ট থাকতে দুনিয়ার আকাশে নেমে আসেন। আসলেই কি আল্লাহ নেমে আসেন, নাকি এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো আল্লাহর রহমত নেমে আসে? দয়া করে জানাবেন।***

আব্দুল্লাহ ওমর, কুমিল্লা

উত্তর : আল্লাহ কুরআন মজীদে নিজেকে যেসব গুণে গুণান্বিত করেছেন এবং যেসব নামে নিজেকে নামকরণ করেছেন তাঁর উপর ঈমান আনয়ন করা আমাদের উপর ওয়াজিব। এমনিভাবে রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আল্লাহর যে সমস্ত নাম ও গুণাবলী বর্ণনা করেছেন কোনো প্রকার পরিবর্তন, পরিবর্ধন অস্বীকৃতি, পরিচয়ের জন্য ধরন-পদ্ধতি নির্ধারণ করা বা উপমা পেশ করা ব্যতীত তার উপর ঈমান আনা আবশ্যক। পরিবর্তন সাধারণতঃ হয়ে থাকে আয়াত ও হাদীসসমূহে। আর অস্বীকার হয়ে থাকে আকীদার ভিতরে। ধরন, পদ্ধতি ও উপমা বর্ণনা করা হয় সিফাত তথা গুণের ভিতরে। সুতরাং উপরোক্ত চারটি দোষ হতে আমাদের আকীদা-বিশ্বাস পরিষ্কার করতে হবে। আল্লাহর নাম ও গুণাবলীর ক্ষেত্রে কেন, কেমন এ ধরনের প্রশ্ন করা যাবে না। এমনিভাবে আল্লাহর গুণাবলীর ব্যাপারে ধরন বর্ণনার চিন্তা করা থেকে মানুষকে সম্পূর্ণ বিরত থাকতে হবে। এই পদ্ধতি অবলম্বন করলে অনেক বিষয় সহজ হয়ে যাবে। এটাই ছিল সালাফে সালেহীনের আদর্শ। ইমাম মালেক (রহমাতুল্লাহি আলাইহি)-এর কাছে এক লোক এসে বলল, হে আবু আবদুর রহমান! আল্লাহ তো আরশের উপরে আছেন, তবে কিভাবে? উত্তরে ইমাম মালেক (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) বললেন, আরশের উপরে থাকার বিষয়টি জ্ঞাত আছে। কিভাবে আছেন তা আমাদের জানার বাইরে। এ বিষয়ে ঈমান রাখা ওয়াজিব। আর এ বিষয়ে প্রশ্ন করা বিদ'আত। আমার মনে হচ্ছে তুমি একজন বিদ'আতী লোক।

যারা বলে, আল্লাহর নেমে আসার দ্বারা উদ্দেশ্য হলো আল্লাহর রহমত নেমে আসা উদ্দেশ্য, তাদের কথার উত্তরে আমরা বলবো যে, এভাবে ব্যাখ্যা করা ঠিক নয়। কুরআন ও হাদীসের শব্দগুলোর হাকীকী অর্থ তথা প্রকৃত অর্থ বুঝতে হবে। সালাফগণ আল্লাহর নুযূল বলতে তাঁর নেমে আসাকেই বুঝতেন। তবে কীভাবে আসেন, সে ব্যাপারে তারা প্রশ্ন করেননি। বরং তারা বুঝতেন যে, আল্লাহর বড়ত্ব ও মর্যাদার জন্য মানানসইভাবে তিনি নেমে আসেন।

১০☞ প্রশ্ন (২) ***আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে গেলে কিংবা পানিতে ডুবে কোনো মানুষ নিখোঁজ হয়ে গেলে, তাকে তো আর কবর দেয়া গেলো না। তবুও কি কবরের আযাব হবে?***

ইয়াসীন সরকার, যশোর

উত্তর : এমন ব্যক্তি যদি আযাবের হকদার হয়, তাহলে অবশ্যই তার আযাব হবে। কারণ আযাব হবে রূহের উপর। কেননা শরীর তো মাটির সাথে মিশে যাবে। তাছাড়া যেহেতু বিষয়টি গায়েবের সাথে সম্পৃক্ত, তাই এ কথা বলা যাবে না যে, দেহের কোনো আযাবই হবে না। যদিও তা নষ্ট হয়ে গেছে বা পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। বিষয়টি বারযাখ তথা কবর জগতের সাথে সম্পৃক্ত। দুনিয়াতে দৃশ্যমান কোনো বস্তুর সাথে পরকালের গায়েবী বিষয়ের তুলনা চলে না।

☞ প্রশ্ন (৩) ***: বলা হয়ে থাকে যে, মুহাম্মাদ বিন আবু বকর আল-সিদ্দিক উসমান (রাযিয়াল্লাহু আনহু),র হত্যাকাণ্ডে শরীক ছিলেন। আমি এ কথার সত্যতা জানতে চাই।***

লুৎফুর রহমান, লক্ষ্মীপুর

উত্তর : উসমান (রাযিয়াল্লাহু আনহু) নিহত হওয়ার সময় মুহাম্মাদ বিন আবু বকর ছিলেন একজন তরুণ, তার মা ছিলেন আসমা বিনতে উমাইস। বিদায় হজ্জের সময় মদিনা থেকে মক্কা যাওয়ার পথে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। তিনি আলী বিন আবি তালিবের তত্ত্বাবধানে বেড়ে ওঠেন।

মুহাম্মাদ বিন আবি বকর উসমান (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর বিরুদ্ধে বিদ্রোহে অংশগ্রহণ করেন। কিন্তু এটা সত্য যে, তিনি তাকে হত্যা করেননি এবং তার হত্যাকাণ্ডে অংশও

নেননি। কিছু বর্ণনায় উল্লেখ করা হয়েছে যে, মুহাম্মদ বিন আবি বকর উসমানের হত্যা বা তার হত্যাকাণ্ডে অংশ নিয়েছিলেন। ইমাম ইবনে কাসীর এটি উল্লেখ করার পরে বলেছেন: সঠিক মত হল যে, অন্যরা এটি করেছে। বরং তিনি উসমান রাযিয়াল্লাহু আনহু-কে বাঁচানোর জন্য চেষ্টা করেছেন এবং ঘরের দরজা বন্ধ করে দিয়ে সেখানে দাড়িয়ে ছিলেন, কিন্তু বিদ্রোহীদের শক্তির সামনে তিনি সক্ষম হননি।[1]

অতএব তিনি কিংবা অন্য কোনো সাহাবী উসমান রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর হত্যায় শরীক ছিলেন না। উসমান রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর স্ত্রী নায়েলা সবসময় বিদ্রোহের দিনগুলোতে ঘরেই ছিলেন। মুহাম্মাদ বিন আবু বকর এবং আরো যাদের ব্যাপারে সন্দেহ হয়েছিল, তাদেরকে পরবর্তীতে নায়েলার কাছে নিয়ে যাওয়া হলে নায়েলা বলেছেন, আমি তাদেরকে হত্যায় শরীক হতে দেখিনি। অন্যরা হত্যা করেছে। সুতরাং প্রমাণিত হলো যে, উসমান রাযিয়াল্লাহু আনহু-কে হত্যায় বিদ্রোহী যালেমরাই শরীক ছিল। কোনো সাহাবী অথবা মর্যাদাবান সাহাবীদের সন্তানগণ এতে শরীক ছিলেন না।

প্রশ্ন (৪) জান্নাতে পুরুষদের জন্য হুর থাকার কথা বলা হয়েছে। প্রশ্ন হল মহিলাদের জন্য কী আছে?

আ: ওয়াহিদ, ঝিনাইদহ

উত্তর : জান্নাতীদের নেয়ামত বর্ণনা করতে গিয়ে আল্লাহ বলেন :

“সেখানে তোমাদের জন্য আছে যা তোমাদের মন চায় এবং সেখানে তোমাদের জন্য আছে, যা তোমরা দাবি কর।”[2] আল্লাহ আরো বলেন :

﴿وَفِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ الْأَنْفُسُ وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ وَأَنْتُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

“এবং তথায় রয়েছে মন যা চায় এবং নয়ন যাতে তৃপ্ত হয়। তোমরা সেখানে চিরকাল থাকবে।”[3]

এটা জানা কথা যে, মন যা চায়, তার মধ্যে সর্বোত্তম হল বিবাহ করার মনোবাসনা। তা জান্নাতীদের জন্য অর্জিত হবে। চাই পুরুষ হোক কিংবা মহিলা হোক। মহিলাকে আল্লাহ তাআ'লা জান্নাতে তাঁকে তাঁর দুনিয়ার স্বামীর সাথে মিলিয়ে দিবেন। যেমন আল্লাহ তাআ'লা বলেন :

﴿رَبَّنَا وَأَدْخِلْهُمْ جَنَّاتِ عَدْنٍ الَّتِي وَعَدْتَهُمْ وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾

“হে আমাদের পালনকর্তা! আর তাদেরকে প্রবেশ করাও চিরকাল বসবাসের জান্নাতে, যার ওয়াদা আপনি তাদেরকে দিয়েছেন এবং তাদের বাপ-দাদা, পতি-পত্নী ও সন্তানদের মধ্যে যারা সৎকর্ম করে তাদেরকে। নিশ্চয় আপনি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।”[4] আর দুনিয়াতে যদি অবিবাহিত থাকে তাহলে জান্নাতে তার নয়ন জুড়ানো কোনো পুরুষের সাথে বিবাহের ব্যবস্থা করবেন।

প্রশ্ন (৫) কিছু লোক বলে থাকে, যুবতী মেয়ে ঘরে রেখে নাকি হজ্জে যাওয়া ঠিক নয়, - এ কথা কি সত্য? দয়া করে জানাবেন।

শিহাব উদ্দীন, বগুড়া

উত্তর : এ রকম কথা মোটেই সঠিক নয়। যুবতী মেয়ে ঘরে থাকার সাথে হজ্জের কোনো সম্পর্ক নেই। হজ্জের সামর্থ্য থাকলে হজ্জ পালন করা ফরয। ইসলাম ধর্ম সম্পর্কে যাদের সামান্য জ্ঞান আছে, তারাও এ রকম প্রশ্ন করতে পারে না। যাদের মনে হজ্জ বা ইসলামের অন্যান্য বিধি-বিধান সম্পর্কে ঘৃণাবোধ রয়েছে, তারাই সুযোগ বুঝে এ রকম আজে-বাজে মন্তব্য করে থাকে। আমরা তাদের হিদায়াত কামনা করছি।

প্রশ্ন (৬) : জনৈক ব্যক্তি ইসলাম সম্বন্ধে জ্ঞান না থাকার কারণে যৌতুক নিয়ে বিয়ে করেছে। এখন সে ভুল বুঝতে পেরে শ্বশুর সাহেবকে টাকাটা ফেরত দিতে যাচ্ছে? ফেরত দেওয়াটা কি ওয়াজিব নাকি তাওবা করলেই চলবে। ফেরত দিতে চাইলে কিভাবে পরিশোধ করতে হবে?

দুলু গাজী, পাবনা

উত্তর : যৌতুক নিয়ে বিবাহ করাটা মারাত্মক অপরাধ। তবে যে ব্যক্তি ভুল-বশত নিয়ে ফেলেছে, তার উপর

[1] আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ৭/২০৭।
[2] সূরা হা-মীম সিজদাহ আয়াত : ৩১-৩২।
[3] সূরা যুখরুফ আয়াত : ৭১।
[4] সূরা গাফের আয়াত : ৮।

আবশ্যক হচ্ছে, সে তাওবা করবে। সেই সঙ্গে শ্বশুর সাহেবের কাছে বিষয়টি পেশ করবে। যদি ফেরত দেওয়ার মতো সামর্থ্য থাকে, তাহলে ফেরত দেওয়ার চেষ্টা করবে। আর যদি ফেরত দেওয়ার মতো অর্থ না থাকে, তাহলে সামর্থ্যবান হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করবে। শ্বশুর সাহেব যদি খুশী মনে সেটা ছেড়ে দেয় তাহলে জোর করে ফেরত দিতে যাবে না। কারণ, শ্বশুর যদি জামাইকে খুশী মনে হাদীয়া-বকশিশ দেয়, তাহলে নিতে কোনো বাধা নেই।

প্রশ্ন (৭) : কবরে সওয়াল-জওয়াবের সময় রাসূল ﷺ-কে কিভাবে দেখানো হবে?

আতাউর রহমান, ময়মনসিংহ

উত্তর : কবরে দাফনকৃত ব্যক্তি রাসূল রাসূল ﷺ-কে দেখবে অথবা নাকীর-মুনকারের সাওয়াল-জাওয়াবের সময় তাঁকে দেখানো হবে, এ বিষয়টি সহীহ হাদীসে আসেনি। বরং তাঁর নবুওয়াত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে। সে তাঁর নবুওয়াতের স্বীকৃত দিতো কি না? এ বিষয়ে বিস্তারিত জানার জন্য শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমিয়া (রহমাতুল্লাহি আলাইহি)- "আল-আকীদাহ আল-ওয়াসেত্বিয়া" এবং শাইখ মুহাম্মাদ আব্দুল ওয়াহ্হাব (রহমাতুল্লাহি আলাইহি)-এর "তিনটি মূলনীতি ও তার প্রমাণ" নামক বই দু'টি পাঠ করার পরামর্শ দিচ্ছি।

প্রশ্ন (৮) : আমাদের মসজিদের একদিকে দেয়াল ঘেসে কিছু পুরাতন কবর আছে। এখন মসজিদ প্রশস্ত করার দরকার। কিভাবে করতে হবে, দয়া করে জানাবেন।

আ: রশিদ, রংপুর

উত্তর : কবরস্থান পুরতান হোক কিংবা নতুন হোক, বিনা কারণে সেখানকার কবর স্থানান্তর করা বৈধ নয়। তবে বিশেষ প্রয়োজনে যদি কবর সরানোর প্রয়োজন পড়ে এবং কবর সরানো ছাড়া আর কোনো উপায় না থাকে, তাহলে কবর অন্যত্র সরিয়ে সেখানে মানুষের প্রয়োজনে বিভিন্ন স্থাপনা নির্মাণ করা যাবে। তবে সেখানে যদি দাফন কৃত মানুষের কোনো অংশ পাওয়া যায়, তাহলে সেগুলো মুসলিমদের অন্যান্য কবরস্থানে সসম্মানে দাফন করতে হবে।

এবার আপনাদের প্রশ্ন প্রসঙ্গে আসি। তার আগে উল্লেখ করতে চাই যে, নবী ﷺ একাধিক সহীহ মারফু হাদীসে কবরকে বহাল তবিয়তে রেখে তার উপর মসজিদ নির্মাণ করতে কঠোর ভাষায় নিষেধ করেছেন এবং সেটাকে অভিশপ্ত ইয়াহুদ-নাসারাদের স্বভাব বলে উল্লেখ করেছেন[৫] অতএব কবরের ওপর মসজিদ নির্মিত হলে সেখানে সালাত বিশুদ্ধ হবে না।

আপনাদের মসজিদের এক দিকের কবরগুলো না সরিয়ে যদি অন্যদিকে মসজিদ প্রশস্ত করার সুযোগ থাকে, তাহলে সেদিকেই প্রশস্ত করা আবশ্যক। অন্যদিকে জায়গা খালি রেখে কবরের ওপর হস্তক্ষেপ করা ঠিক হবে না। আর যদি মুসাল্লিদের প্রয়োজনে কবরের দিকেই মসজিদ সম্প্রসারণ করার প্রয়োজন পড়ে, তাহলে কবরগুলো অন্যত্র সরিয়ে নিয়ে সেখানে মসজিদ নির্মাণ করা যাবে। অতএব, প্রয়োজন সাপেক্ষ আপনাদের মসজিদ প্রশস্ত করার জন্য কবরগুলো অন্যত্র সরানো জায়েয আছে।[৬] এখানে আরো উল্লেখ্য যে, জাবের (রাযিয়াল্লাহু আনহু) তার পিতা আব্দুল্লাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-কে দাফন করার ছয় মাস পর তার কবর থেকে বের করে অন্যত্র দাফন করেছেন।[৭]

প্রশ্ন (৯) : বিকাশে লেনে-দেন করার হুকুম জানতে চাই

মশিউর রহমান, রাজশাহী

উত্তর : আধুনিক লেনদেনের অন্যতম একটি মাধ্যম হচ্ছে বিকাশ। এটা ব্র্যাক-এর একটি অঙ্গ প্রতিষ্ঠান। উল্লেখ্য যে, ব্র্যাক ব্যাংক হচ্ছে বাংলাদেশের অন্যান্য ব্যাংক এর মতোই একটি সুদি ব্যাংক। সুদি ব্যাংক এর সাথে লেনদেন করা বৈধ নয়। এমনকি সুদি ব্যাংক-এর গাড়িচালক হয়ে তাদেরকে আনা-নেওয়া করাও বৈধ নয়। এ ব্যাপারে আলেমদের ফতোয়া একদম পরিষ্কার। তবে বিশেষ প্রয়োজনে যেহেতু সুদি ব্যাংক এর সাথে লেনদেন করা বৈধ, অনুরূপ প্রয়োজন বশত বিকাশ ব্যবহার করলে গুনাহ হবে না। কেননা ইসলামী

[৫] সহীহ বুখারী, হা : ৪৩৫।
[৬] ফাতাওয়া নূরুন আলাদ দারব, ফাতাওয়া নং ১১৯।
[৭] সহীহ বুখারী হা : ১৩৫২।

শরীয়তেরএকটিমূলনীতিহচ্ছে, الضرورت تبيح المحذورات অর্থাৎ বিশেষ প্রয়োজনে অবৈধ জিনিষ গ্রহণ করা বৈধ"। যেমন জান বাঁচানোর জন্য মৃত জন্তুর গোশত ভক্ষণ করা যেতে পারে। তবে বিকাশ ব্যবহার না করে যদি বিকল্প বৈধ ব্যবস্থা থাকে, তাহলে বিকাশ বাদ দিয়ে সেই বৈধ পন্থা ব্যবহার করা এবং বিকাশ ব্যবহার না করাই ভালো। আল্লাহই অধিক জানেন।

প্রশ্ন (১০) : গরীব-দুখী অথবা সিয়াম পালনকারীদেরকে খাওয়ানোর উদ্দেশ্যে টাকা উঠানো, যেখানে অনেকেই বিভিন্ন নিয়তে টাকা দিয়ে অংশ গ্রহণ করে, অতঃপর যখন খাবারের আয়োজন করা হয়, তখন ঐ টাকা দানকারী ব্যক্তি, তার পরিবার এবং টাকা জমাকারীরা ঐ খাবার থেকে নিজেরাও খায়। তাদের কি খাওয়াটা জায়েয হবে? অনুগ্রহ করে দলীলসহ জানাবেন।

মাহিরুল ইসলাম, গাইবান্ধা

উত্তর : গরীব ও সিয়াম পালনকারীদের জন্য তোলা বা দান করা খাবার থেকে টাকা সংগ্রহকারী, দাতা বা তাদের পরিবারের খাওয়া জায়েয কি না, তা নির্ভর করে টাকা দানকারীদের নিয়তের ওপর। যদি টাকাগুলো নির্দিষ্টভাবে শুধু গরীব ও মিসকিনদের মালিক বানিয়ে দেওয়ার নিয়তে দেওয়া হয়, তবে দাতা বা আয়োজকদের জন্য তা খাওয়া জায়েয নয়। আর যদি খাবারটি সাধারণ ইফতার মাহফিল হয়, যা সবার জন্য উন্মুক্ত এবং দাতারাও সাধারণ নিয়তে অংশ নেয়, তবে খাওয়া জায়েয।

টাকাগুলো যদি যাকাত, ফিতরা বা এমন কসমের কাফফারার হয় যা কেবল গরীবের হক, তবে তা ধনী বা আয়োজকরা খেতে পারবে না।

আর যদি স্পষ্টভাবে বলা হয় যে, এটি শুধু দুস্থদের খাওয়ানোর জন্য, তবে দাতা বা আয়োজকদের নিয়ত তাদেরকে মালিকানা দিয়ে দেওয়া। সে ক্ষেত্রে নিজেরা খেলে আমানতের খেয়ানত হবে। যদি সাধারণত মেহমানদারি বা উন্মুক্ত ইফতারের উদ্দেশ্যে তোলা হয়, যেখানে সবার অংশগ্রহণ বৈধ। যেখানে আয়োজকদের পক্ষ থেকে আগেই পরিষ্কার করা থাকে যে, এতে সবাই খেতে পারবে, সেখান থেকে খেতে কোনো বাধা নেই। আর যদি শর্তহীন দান হয় এবং দাতারা যদি খাবার আয়োজনের পর আয়োজকদের বা সবাইকে খাওয়ার সাধারণ অনুমতি দিয়ে দেন, তবে তা জায়েয। এ ক্ষেত্রে দলীল ও মূলনীতি হলো- দানকারীর শর্ত ও নিয়ত অনুযায়ী সদাকার মাল ব্যবহার করতে হবে। আল্লাহ তা'আলা কুরআনে যাকাত বা অন্যান্য সাদাকা গ্রহণের খাতগুলো সূরা তাওবার ৬০ নং আয়াতে নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন। সেখান থেকে বিষয়টি পড়ে নেওয়া যেতে পারে। তবে সাধারণ ইফতার ফান্ড বা কালেকশন যদি দানশীলদের পক্ষ থেকে সবার জন্য উন্মুক্ত (মুবাহ) হিসেবে ঘোষণা করা হয়, তবে তা সাধারণ মেহমানদারির হুকুমে অন্তর্ভুক্ত হয়।

২) ওয়াকফ্‌বিহীন জায়গা কিংবা খাস যমীনে স্থায়ীভাবে মসজিদ বানানো যাবে কি?

উত্তর : না, যাবে না। কারণ, ওয়াকফ্ ছাড়া অন্যের ব্যক্তিগত জায়গা কিংবা সরকারি খাস যমীনে স্থায়ীভাবে মসজিদ বানানো নিষেধ। কারণ, মসজিদ স্থায়ী হওয়ার জন্য জায়গাটি সম্পূর্ণ মালিকানাধীন ও ওয়াকফ্ হওয়া শর্ত। খাস যমীনে মসজিদ বানাতে হলে সরকারের অনুমতি বা যমীন বৈধভাবে বরাদ্দ নিতে হবে। খাস যমীন সরকারি সম্পত্তি। বিনা অনুমতিতে সেখানে স্থায়ী স্থাপনা নির্মাণ করা অবৈধ। অন্যের মালিকানাধীন যমীনে মালিকের অনুমতি ও দান ছাড়া মসজিদ নির্মাণ করা যায় না। যমীন ওয়াকফ্ বা স্থায়ীভাবে আল্লাহর নামে দান না করলে তা মসজিদ হিসেবে গণ্য হয় না। তবে এ ধরনের যমীনে অস্থায়ীভাবে সালাতের জায়গা নির্ধারণ করে সালাত চালিয়ে যেতে কোনো মানা নেই।

করণীয় ও বিকল্প : খাস যমীন আগে সরকারের কাছ থেকে বৈধভাবে বরাদ্দ বা স্থায়ী বন্দোবস্ত নিতে হবে। অথবা যমীন দাতাদের মাধ্যমে কিনে ওয়াকফ্ রেজিস্ট্রি করতে হবে।

প্রশ্ন (১১) : কোনো অমুসলিম দাওয়াত দিলে তার দাওয়াত খাওয়া যাবে কি? যেমন বিবাহ অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করা ইত্যাদি?

গুরজার রহমান, বরিশাল

উত্তর : অমুসলিমদের বিয়ের অনুষ্ঠানে একজন মুসলিমের অংশগ্রহণের প্রকৃতির ওপর নির্ভর করে এর

হুকুম ভিন্ন ভিন্ন হয়। নৈতিকতা ও আত্মীয়তার দাবি হিসেবে কিংবা সামাজিক বিষয় হিসেবে কোনো অমুসলিমকে তার বিয়ের জন্য অভিনন্দন জানানো জায়েয, যদি তা কোনো বাতিলের প্রতি সমর্থন থেকে মুক্ত থাকে। তবে সেই অনুষ্ঠানে যোগদান করা নিষিদ্ধ, যদি তাতে মদ্যপান, নারী-পুরুষের অশালীন মেলামেশা বা ধর্মবিরোধী আচার-অনুষ্ঠানের মতো নিষিদ্ধ কাজ অন্তর্ভুক্ত থাকে।

অমুসলিমদের বিবাহ অনুষ্ঠান কিংবা তাদের অন্যান্য সামাজিক অনুষ্ঠানে যোগদানের শর্তাবলী নিম্নরূপ : (১) ইসলামবিরোধী কোনো কিছু থেকে মুক্ত হওয়া : ইসলামবিরোধী কোনো বিশ্বাসের সমর্থনসূচক শব্দ ব্যবহার না করে, সদাচরণ ও সুপ্রতিবেশীসুলভ আচরণের নিদর্শন হিসেবে কোনো অমুসলিমকে যেমন প্রতিবেশী, সহকর্মী বা আত্মীয়, তার বিয়ের জন্য অভিনন্দন জানানো জায়েয।

(২) আত্মীয়তা ও প্রতিবেশীর সম্পর্ক : যদি বর আত্মীয় বা প্রতিবেশী হয়, তবে কিছু ফতোয়া অনুযায়ী আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখার প্রয়োজনে বিয়ের অনুষ্ঠানে যোগদান করার অনুমতি রয়েছে, তবে শর্ত হলো অনুষ্ঠানস্থলটি নিষিদ্ধ কাজ থেকে মুক্ত হতে হবে। **(৩) নিষিদ্ধ কাজ থেকে মুক্ত হওয়া** : অমুসলিমদের এমন অনুষ্ঠানে উদযাপনে যোগদান করা নিষিদ্ধ, যদি তাতে মদ্যপান, নিষিদ্ধ সঙ্গীত বাজানো, নারী-পুরুষের নিষিদ্ধ মেলামেশা অথবা এমন বহুঈশ্বরবাদী ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান পালন করা হয়।

(৪) তাদের উপাসনালয়ে প্রবেশ না করা : অধিকাংশ আলেম ধর্মীয় বিবাহ অনুষ্ঠানে যোগদানের জন্য গির্জা বা তাদের উপাসনালয়ে প্রবেশ করতে নিষেধ করেছেন। কারণ সেখানে ইসলামের পরিপন্থী কথা শোনার বা নিষিদ্ধ কাজ দেখার সম্ভাবনা থাকে।

☞ প্রশ্ন (১২) : স্ত্রী সহবাসের দু'আ শুধু স্বামী পাঠ করবে নাকি স্ত্রীকেও পাঠ করতে হবে? পড়তে ভুলে গেলে সেক্ষেত্রে করণীয় কী?

আব্দুল হাকীম, দিনাজপুর

উত্তর : ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর হাদিস অনুসারে, কোনো পুরুষ যখন তার স্ত্রীর সাথে সহবাস করার নিয়ত করে, তখন দু'আটি পাঠ করা তার জন্য মুস্তাহাব। রাসূল ﷺ বলেন, তোমাদের মধ্যে কেউ যদি তার স্ত্রীর সাথে সহবাস করার নিয়ত করার সময় বলে,

بِاسْمِ اللَّهِ، اللَّهُمَّ جَنِّبْنَا الشَّيْطَانَ وَجَنِّبِ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا

'আল্লাহর নামে, হে আল্লাহ, আমাদেরকে শয়তান থেকে দূরে রাখো এবং শয়তানকে তোমার দেওয়া রিযিক থেকে দূরে রাখো, তাহলে যদি তাদের মধ্যে কোনো সন্তান গর্ভে আসে, তবে শয়তান তার কোনো ক্ষতি করতে পারবে না।" (বুখারী ও মুসলিম এবং সুনানের সংকলকগণ ও অন্যান্যরা এটি বর্ণনা করেছেন। তবে, কোনো নারীও যদি এই দু'আটি পাঠ করে, তাতে কোনো ক্ষতি নেই। কারণ এটি শুধু পুরুষদের জন্য নির্দিষ্ট নয়।[৮]

ইমাম আলবানী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) বলেছেন, যদি কেউ কখনো সহবাসের দু'আ ভুলে যায়, কিন্তু সর্বদা তা পাঠ করে, তাহলে আমার মতে আল্লাহ তাকে শয়তানের হস্তক্ষেপ থেকে রক্ষা করবেন।[৯]

☞ প্রশ্ন (১৩) বিনা ওযুতে কুরআন মজিদ স্পর্শ করা যাবে কি?

উত্তর : অধিকাংশ আলেমের মতে, কোনো মুসলিমের জন্য পবিত্র অবস্থা ছাড়া কুরআন স্পর্শ করা জায়েয নয়। এই মতটি চার ইমাম (রাদিয়াল্লাহু আনহুম) পোষণ করেন এবং এর ভিত্তিতেই নবী ﷺ-এর সাহাবীগণ ফতোয়া জারি করতেন। এ বিষয়ে আমর ইবনে হাযম (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত একটি সহীহ ও গ্রহণযোগ্য হাদিস রয়েছে: নবী (ﷺ) ইয়েমেনের অধিবাসীদের উদ্দেশ্যে লিখেছিলেন যে, أن لايمس القرآن إلا طاهر "পবিত্র ব্যক্তি ব্যতীত কেউ যেন কুরআন স্পর্শ না করে"।[১০] এটি একটি হাসান হাদীস, যার সনদগুলো পরস্পরকে শক্তিশালী করে। সুতরাং, এটা জানা যায় যে, বড় ও ছোট অপবিত্রতা থেকে সম্পূর্ণ পবিত্র অবস্থা ব্যতীত কোনো মুসলিমের জন্য কুরআন স্পর্শ করা জায়েজ নয়।

---

[৮] স্থায়ী কমিটির ফতোয়া, ১৯/৩৫৬।
[৯] আল-হুদা ওয়ান-নূর সিরিজ : ১২।
[১০] মুআত্তা মালেক, হা : ২১৯/৬৮০।

প্রশ্ন (১৪) : বেতেরের সালাত পড়ার সঠিক পদ্ধতি কেমন এবং কত রাকআত?

বেলাল হোসেন, কুমিল্লা

উত্তর বিতর সালাত সুন্নাতে মুআক্কাদা। এ এক রাক'আত নামায পড়ার মাধ্যমে রাতের নামায সমাপ্ত করাকে বিতর বলা হয়। বিতর হলো, রাতের তাহাজ্জুদ সালাত এক রাক'আত বা একাধারে তিন রাক'আত নামায আদায় করার মাধ্যমে শেষ করার নাম।[১১] অতএব বিতর সালাত সুন্নাত মুআক্কাদা। উহা পরিত্যাগ করা উচিত নয়।

তিন রাক'আত বিতর সালাত দুইভাবে পড়া যেতে পারে। একাধারে তিন রাক'আত পড়বে। অথবা প্রথমে দুই রাক'আত পড়ে সালাম ফিরিয়ে দিয়ে আরেক রাক'আত পড়বে। অথবা শুধু এক রাক'আত বিতরও পড়া জায়েয আছে।

নবী ﷺ রাতের সালাত দু'দু রাক'আত করে আদায় করতেন। অতঃপর তিন রাক'আত বিতর পড়তেন। এতে তাশাহহুদ পাঠ বা বসার মাধ্যমে পার্থক্য করতেন না। হারব বলেন : ইমাম আহমাদকে বিতর সালাত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন, দুই রাকা'আত পড়ে সালাম ফিরাবে। সালাম না ফিরালেও আমার মতে কোনো অসুবিধা নেই। তবে নবী ﷺ থেকে সালাম ফিরানোর বর্ণনাই অধিক বিশুদ্ধ বলে প্রমাণিত। আবু তালেব থেকে এক বর্ণনায় এসেছে, এক রাক'আত বিতর পড়ার ব্যাপারেই অধিকাংশ এবং অধিক শক্তিশালী হাদীস বর্ণিত হয়েছে। ইবনুল কাইয়্যিম (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) বলেন, আমিও এই মতের পক্ষপাতী।[১২]

প্রশ্ন (১৫) : দাজ্জাল কি মানুষ হবে? সে কোথায় বের হবে?

উত্তর : দাজ্জাল হবে একজন মানুষ, আদমের সন্তানদের একজন এবং তার মানবিক বৈশিষ্ট্য থাকবে। সে শেষ সময়ে পূর্ব দিক থেকে, বিশেষ করে খোরাসান থেকে, ইসফাহানের ইহুদীয়া মহল্লা নামে পরিচিত একটি পথ দিয়ে আবির্ভূত হবে। দাজ্জাল একজন বাস্তব মানুষ, যার নির্দিষ্ট শারীরিক বৈশিষ্ট্য রয়েছে যা নবী মুহাম্মদ ﷺ উল্লেখ করেছেন। সে হবে খাটো, ধনুকাকৃতির পা, কোঁকড়া চুল এবং একচোখা। সুনান তিরমিযীতে নবী ﷺ-এর সূত্রে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেছেন :

الدجال يخرج من أرض بالمشرق يقال لها: خراسان.

"দাজ্জাল পূর্বদিকের খোরাসান নামক একটি স্থান থেকে আবির্ভূত হবে।" এটি ইরানের একটি অংশ"।[১৩] বর্তমানে এটা ইরানের অংশ। আনাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেছেন,

«يَخْرُجُ الدَّجَّالُ مِنْ يَهُودِيَّةِ أَصْبَهَانَ، مَعَهُ سَبْعُونَ أَلْفًا مِنَ الْيَهُودِ»

"দাজ্জাল ইসফাহানের ইহুদীয়া মহল্লা থেকে সত্তর হাজার ইহুদিকে সঙ্গে নিয়ে আবির্ভূত হবে।"[১৪] ইমাম আহমাদ তাঁর মুসনাদে বর্ণনা করেছেন এবং ইবনে হাজার এটিকে সহীহ বলে প্রমাণ করেছেন। এই বর্ণনার সাথে প্রথম বর্ণনাটির কোনো বিরোধ নেই, কারণ খোরাসান একটি বিশাল অঞ্চল, যা ইসফাহানসহ বেশ কয়েকটি শহরকে অন্তর্ভুক্ত করে।

ইবনে হাজার বলেছেন, "সে কোথা থেকে আবির্ভূত হবে, সে ব্যাপারে বলতে গেলে, তা অবশ্যই পূর্বদিক থেকে হবে।" ইবনে কাসির (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) বলেছেন : "তার আবির্ভাব ইসফাহানে, ইহুদিয়া মহল্লা নামক একটি এলাকা থেকে শুরু হবে।"

হাদীসে বর্ণিত এবং আলেমগণ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত তথ্য অনুসারে, এটিই তাঁর আবির্ভাবের স্থান। এটি কিয়ামতের অন্যতম প্রধান নিদর্শন এবং অন্যতম বড় একটি ফিতনা। আমরা আল্লাহর কাছে নিরাপত্তা ও মঙ্গল কামনা করি।

প্রশ্ন (১৬) : টেলিভিশন, ইন্টারনেট, ভিডিও ইত্যাদি দেখার হুকুম কী?

উত্তর : টেলিভিশন, ইরন্টারনেট, ভিডিও মূলত অন্য যেকোনো যন্ত্রের মতোই একটি যন্ত্র এবং এর ব্যবহারের

[১১] সহীহ বুখারী হা : ৯৯০।
[১২] যাদুল মাআদ।
[১৩] সুনান তিরমিযী হা : ২২৩৭।
[১৪] মুসনাদুল ইমাম আহমাদ হা : ১৩৩৪৪

বিধান নির্ভর করে এতে কী দেখানো হচ্ছে তার ওপর। যা কিছু উপকারী ও অনুমোদিত, তা দেখা বৈধ এবং যা কিছু নিষিদ্ধ বা যাতে অশ্লীলতা, গান, সঙ্গীত বা মন্দ বিষয় রয়েছে, তা নিষিদ্ধ। একজন মুসলিমকে অবশ্যই এর ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ করতে হবে এবং তার ঘরে কী প্রবেশ করছে তার ওপর নজর রাখতে হবে।

এর ব্যবহারের জন্য ইসলামী নির্দেশিকাগুলো নিম্নরূপ: সংবাদ, ধর্মীয়, বৈজ্ঞানিক এবং সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মতো উপকারী অনুষ্ঠান দেখা বৈধ এবং এতে কোনো ক্ষতি নেই। অশ্লীল চলচ্চিত্র, নারীর ছবি দেখা এবং সঙ্গীত ও গান শোনার মতো নিষিদ্ধ জিনিস দেখা থেকে বিরত থাকতে হবে। এই যন্ত্রটিকে নির্ধারিত সময়ে সালাত পড়া বা পারিবারিক দায়িত্ব পালনে অবহেলার কারণ হতে দেয়া যাবে না। ফিতনা এবং নিষিদ্ধ কাজে লিপ্ত হওয়া থেকে সতর্ক থাকতে হবে, কারণ কিছু আলেম লালন-পালনের ওপর এর নেতিবাচক প্রভাবের আশঙ্কায় এটিকে ঘরে আনা মাকরূহ বলে গণ্য করেছেন।

প্রশ্ন (১৭) : তাকদীর সম্পর্কে একটি প্রশ্ন করতে চাই। তা হলো আল্লাহ যে বিষয়ের ইচ্ছা করেন বা নির্ধারণ করেন, তা ব্যতীত বান্দার পক্ষে অন্য কিছু নির্বাচন করা কি সম্ভব?

আতাউর রহমান

উত্তর : আল্লাহ যে বিষয়ের ইচ্ছা করেন বা নির্ধারণ করেন, তা ব্যতীত বান্দার পক্ষে অন্য কিছু নির্বাচন করা সম্ভব নয়। বরং বান্দা যখন কোনো কিছু করবে, তখন সে অবশ্যই মনে করবে যে, এটা আল্লাহর পক্ষ হতে নির্ধারিত। আল্লাহ তাঁর বান্দাদের সকল কর্ম সৃষ্টি ও নির্ধারণ করেন। আর বান্দা প্রকাশ্যভাবে তা সম্পাদন করে। বান্দা যখন কর্ম সম্পাদন করে, তখন সে অনুভবই করতে পারে না যে, কেউ তাকে কাজটি করতে বাধ্য করছে। বাহ্যিক উপকরণের মাধ্যমে বান্দা যখন কাজটি করে ফেলে, তখন সে দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করবে যে, আল্লাহই তার ভাগ্যে এটা লিপিবদ্ধ করে রেখেছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ﴾

“নিশ্চয়ই আমি প্রত্যেক জিনিষ সুনির্দিষ্ট পরিমাপে সৃষ্টি করেছি”।[১৫]

প্রশ্ন (১৮) : পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে যেহেতু জুম'আর দিন একসাথে শুরু হয় না, তাই জুম'আর দিনে কিয়ামত সংঘটিত হলে তো পৃথিবীর সবদেশে একই দিনে কিয়ামত হচ্ছে না। এই প্রশ্নের জবাব কী?

উত্তর : কিয়ামত জুম'আর দিনেই সংঘটিত হবে। হাদীসে যেভাবে এসেছে, সেভাবেই বিশ্বাস করতে হবে। তাই এ বিষয়ে কোনো মতভেদ নেই। কিয়ামতের বিষয়টি গায়েবের অন্তর্ভুক্ত, যা আল্লাহ ছাড়া অন্য কেউ জানে না। সমগ্র পৃথিবীতে কিবয়ামত এক দিনেই কায়েম হয়ে যাবে। সুতরাং সেই দিনটিকে আমাদের এই দুনিয়ার সাধারণ দিনগুলোর সাথে পরিমাপ বা তুলনা করা যাবে না। পৃথিবীর সব দেশে যেহেতু একই সময়ে জুমআর দিন হয় না, তাই একই দিনে সবখানে কিয়ামত কীভাবে হবে, এই প্রশ্ন করা যাবে না। কারণ, এটা আল্লাহর কাজ। আপনার জন্য বা আপনার দৃষ্টিতে যা কঠিন মনে হয়, তা আল্লাহর কাছে মোটেই কঠিন নয়; বরং একদম সহজ।

প্রশ্ন (১৯) : মাসবকু তথা যারা কিছু সালাত চলে যাওয়ার পর জামা'আতে শরিক হয়, তারা বাকী সালাত আদায় করার জন্য কখন দাঁড়াবে? ইমামের দুই সালামের পর নাকি এক সালামের পর?

মোকাম্মাল, বরুয়াল, হরিপুর, ঠাকুরগাঁও।

উত্তর : যে মুসাল্লী সালাতের কিছু অংশ চলে যাওয়ার পর জামাআতে শরীক হয়, তাকে মাসবুক বলা হয়। এখন প্রশ্ন হলো, তার ছুটে যাওয়া সালাত আদায় করার জন্য সে কখন দাঁড়াবে? ইমাম একদিকে সালাম ফিরানোর পর নাকি উভয় দিকে সালাম ফিরানোর পর? এ বিষয়ে আলেমদের দু'টি প্রসিদ্ধ মত রয়েছে। একটি মত হচ্ছে, একদিকে সালাম ফিরানোর পরপরই মাসবুক অসমাপ্ত সালাত পরিপূর্ণ করার জন্য দাঁড়িয়ে যেতে পারবে। অন্য মতটি হচ্ছে সালাম ফিরানো যেহেতু সালাতের রুকন এবং সালাম ফিরানো বলতে যেহেতু দুই দিকে সালাম ফিরানোকেই বুঝায়, তাই রুকনটি পুরোপুরি পালিত হওয়ার পরই মাসবুকের দাঁড়ানো উচিত। মতভেদ ও সন্দেহ থেকে বাঁচার জন্য এটাই সর্বোত্তম পন্থা।

[১৫] সূরা কামার আয়াত : ৪৯।

সূচিপত্র

"বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস"– প্রকাশিত বইসমূহ

নং	বই-এর নাম	লেখকের নাম	হাদীয়া
১	কালেমা তাইয়েবা	আল্লামা মোহাম্মদ আব্দুল্লাহেল কাফী আল-কোরায়শী	২০/-
২	আহলে হাদীস পরিচিতি	"	১৪০/-
৩	নবুওয়াতে মুহাম্মাদী	"	৭০/-
৪	সিয়ামে রামাযান	"	৩২/-
৫	তারাবীহ	"	৩০/-
৬	ঈদে কুরবান	"	৪০/-
৭	তিন তালাক প্রসঙ্গ	"	১৫/-
৮	ফিরকাবন্দী বনাম অনুসরণীয় ইমামগণের নীতি	"	৫০/-
৯	মুরগী আগে জন্মেছে না ডিম	"	২৪/-
১০	ফাতাওয়া ও মাসায়েল	"	১৭৫/-
১১	ইসলামী অর্থনীতির ক খ	"	১০০/-
১২	আহলে কিবলার পিছনে নামায	"	৭/-
১৩	ধর্ম বিজ্ঞান প্রগতি	প্রফেসর ড. মুহাম্মদ আব্দুল বারী	২০/-
১৪	বুলুগুল মারাম	অনুবাদ : মাও. আব্দুর রহমান	১০০/-
১৫	কিতাবুল কাবায়ির	"	৭০/-
১৬	নবুওয়াতী যুগে ইসলাম প্রচারে নারীদের অবদান	প্রফেসর ড. সুলাইমান বিন হামাদ আল-আওদাহ	১০০/-
১৭	সহীহ আল্-কালিমুত্ তাইয়িব	শায়খ মুহাম্মদ নাসেরু-দ্-দীন আল্-আলবানী	৫০/-

বাৎসরিক ৩৬০/- (তিনশত ষাট টাকা) প্রদান করে মাসিক তর্জুমানুল হাদীস-এর গ্রাহক হোন!
কুরআন ও সহীহ হাদীস মোতাবেক আলোকিত জীবন গড়ুন!!

দৃষ্টি আকর্ষণ

বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস, মাসিক তর্জুমানুল হাদীস এবং সাপ্তাহিক আরাফাত-এর সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে জানানো যাচ্ছে যে, প্রতিটি বিভাগের জন্য নির্ধারিত ফি, দান-অনুদানসহ যাবতীয় লেনদেন নিম্নবর্ণিত সংশ্লিষ্ট **ব্যাংক একাউন্ট**-এ পৃথকভাবে প্রেরণ করার জন্য অনুরোধ করা যাচ্ছে।

ব্যাংক একাউন্টসমূহ

"বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস"
ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লি.
নওয়াবপুর রোড শাখা
সঞ্চয়ী হিসাব নম্বর- ২৮৫৬
যোগাযোগ : ০১৯৩৩৩৫৫৯০৫

"বিকাশ নম্বর"
০১৯৩৩ ৩৫৫ ৯০৫
চার্জসহ বিকাশ নম্বরে টাকা প্রেরণ করে **০১৯৩৩৩৫৫৯০৫ মোবাইল নম্বরে ফোন করে নিশ্চিত হোন।**

"মাসিক তর্জুমানুল হাদীস"
শাহজালাল ইসলামী ব্যাংক লি.
বংশাল শাখা
সঞ্চয়ী হিসাব নম্বর-৪০০৯১৩১০০০০১৪৪০
যোগাযোগ ও বিকাশ : ০১৯৩৩৩৫৫৯০৮

"সাপ্তাহিক আরাফাত"
ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লি.
বংশাল শাখা
সঞ্চয়ী হিসাব নম্বর- ১৩৩৫৯
যোগাযোগ : ০১৯৩৩৩৫৫৯১০

বিশেষ দ্রষ্টব্য : প্রতিটি বিভাগে পৃথক পৃথক মোবাইল নম্বর প্রদত্ত হলো। লেনদেন-এর পর সংশ্লিষ্ট বিভাগে প্রদত্ত মোবাইল নম্বরে ফোন করে নিশ্চিত হওয়ার জন্য অনুরোধ করা যাচ্ছে।

The Monthly Tarjumanul Hadeeth Reg. DA. 142

আসসালামু আলাইকুম

আহলান ওয়া সাহলান। ইন শা-আল্লাহ

দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণের জন্য আপনার এই অনুদান
তাওহীদ ও সুন্নাহভিত্তিক কার্যক্রমকে করবে আরও বেগবান

জমঈয়ত কেন্দ্রীয় ফান্ড

ডিজিটাল দান বাক্স

দান করতে আপনার মোবাইল ব্যাংকিং অ্যাপ অথবা ব্যাংকিং অ্যাপ থেকে স্ক্যান করুন

ব্যাংক একাউন্ট: "বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস"
সঞ্চয়ী হিসাব নং: ২০৫০১১৮০২০০২৮৫৬০০
ইসলামী ব্যাংক, নবাবপুর রোড শাখা।
bKash নগদ রকেট ০১৯৩৩৩৫৫৯০৫ (পার্সোনাল)

জমঈয়ত যাকাত ফান্ড

ডিজিটাল দান বাক্স

দান করতে আপনার মোবাইল ব্যাংকিং অ্যাপ অথবা ব্যাংকিং অ্যাপ থেকে স্ক্যান করুন

ব্যাংক একাউন্ট: "বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস"
সঞ্চয়ী হিসাব নং: ২০৫০১০২০২০০৬২০৮০৭
ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ পিএলসি, লোকাল অফিস, মতিঝিল শাখা।
bKash নগদ রকেট ০১৯৩৩৩৫৫৯০৪ (পার্সোনাল)

জমঈয়ত কল্যাণ ফান্ড

ডিজিটাল দান বাক্স

দান করতে আপনার মোবাইল ব্যাংকিং অ্যাপ অথবা ব্যাংকিং অ্যাপ থেকে স্ক্যান করুন

ব্যাংক একাউন্ট: "জমঈয়ত কল্যাণ ফান্ড"
সঞ্চয়ী হিসাব নং: ৪০০৯১১১০০০১২২১৪
শাহজালাল ইসলামী ব্যাংক পিএলসি, বংশাল শাখা।
bKash নগদ ০১৯৩৩৩৫৫৯০২ (মার্চেন্ট)

আমাদের কর্মসূচি এবং প্রকল্পসমূহ

- দেশব্যাপী সাংগঠনিক কার্যক্রম পরিচালনা
- ইয়াতীমখানা পরিচালনা
- দুঃস্থ মুসলিম পুনর্বাসন
- নওমুসলিম পুনর্বাসন
- প্রাকৃতিক দুর্যোগে ত্রাণ ও পুনর্বাসন
- সুপেয় পানির জন্য নলকূপ স্থাপন
- সাপ্তাহিক-মাসিক পত্রিকা প্রকাশ
- আহলে হাদীস শিক্ষাবোর্ড পরিচালনা
- পাঠ্যপুস্তক প্রকাশ ও শিক্ষক প্রশিক্ষণ
- অনলাইন-অফলাইন দাওয়াতী প্রোগ্রাম
- আন্তর্জাতিক সম্মেলন আয়োজন
- আধুনিক প্রিন্টিং প্রেস প্রতিষ্ঠা
- দেশব্যাপী ইমাম ও দাঈ প্রশিক্ষণ
- গবেষণা ও ইসলামী বইপত্র প্রকাশ
- মসজিদ প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনা
- মাদরাসা প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনা
- কারিগরি কলেজ প্রকল্প
- ট্রেইনিং ইন্সটিটিউট প্রতিষ্ঠা
- বিশ্বমানের জামি'আ আরাবিয়া প্রকল্প
- আন্তর্জাতিক বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনা
- শিশু ও বয়স্কদের জন্য মক্তব প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনা
- ডায়াগনস্টিক ল্যাব, মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল প্রকল্প

বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস

৭৯/ক/৩, জমঈয়ত ভবন, উত্তর যাত্রাবাড়ি, ঢাকা-১২০৪
02 22 445 8551, 01933355901, jamiyat1946.bd@gmail.com www.jamiyat.org.bd

বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস-এর পক্ষে সভাপতি অধ্যাপক ডক্টর আব্দুল্লাহ ফারুক কর্তৃক
৯৮, নওয়াবপুর রোড, ঢাকা- ১১০০, বাংলাদেশ হতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।